# ĀNANDA VĀRTĀ

BENGALI & ENGLISH

MAY—1956

SIXTIETH JAYANTI CELEBRATION

Vol. IV  No. 1.

# Contents

## Bengali Section



## English Section



---

Price : Rs. 1/8/-

Annual subscription ( for four issues ) : India Rs. 4/- Foreign Rs. 5/-

*Printed & Published by*—Brahmachari Kamal Bhattacharjee for Shree Shree Anandamayee Sangh, Banaras, at the Kamala Press, Godhowlia, Banaras.

# শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্ কৃত ব্যাখ্যাসহ

মা—অহেতুক কৃপা ?—নিশ্চয়ই, কৃপা ত অহেতুকই। কাজ করলে ফল পেলে। পিতার সেবা করলে, সেবায় সুখী হয়ে তোমাকে একটা দান করে দিলেন, এটা কর্ম্মের ফল। কর পাও। আর স্বভাবতঃ যে পিতা পুত্রের নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে, সেটা কোন কর্ম্মের অপেক্ষা ত রাখে না। পরম পিতা, পরম মাতা, পরম বন্ধু—সবই ত সে। কাজেই হেতু কোথায় ? তাঁর, তিনি যে ভাবে আকর্ষণ ক'রে নিবেন নিজকে প্রকাশ করবেন বলে। তোমাদের যে ইচ্ছা জাগরণ তাঁকে পাবার জন্য সেই; ইচ্ছাটি দিল কে ? সেই কর্ম্মটি দিল কে ?

তাহা হইলে ভেবে দেখ, তাঁর থেকেই সব আসছে। কোন শক্তি তোমাতে, কোন পটুতা তোমাতে, তুমিই বা কোথা হ'তে তাঁকে পাবার জন্য, আবরণ নষ্ট করার জন্য ? যত ইতি সবই ত তাঁর নিকট হ'তে আসে। তবেই তুমি তোমাকে পাবার চেষ্টা কর। একটা নিশ্বাসও কি তোমার অধীন ? তোমাকে যতটুকু কর্ত্তা বোধে তিনি রেখেছেন সেই কর্ত্তা ভাবটি যদি—আমি ভগবানকে পাবার চেষ্টা করব—এটা বোঝ, তবে তোমার লাভ। আর এই কর্ত্তাটুকু ভগবান দূরে আছেন, দূর বুদ্ধি- এই ভাবটা নিজের বাসনায় যতটা লাগাবে সেইটিই অকর্ম্ম। তাঁহারই প্রকাশ সবেতে বিচার রাখা। যেখানে ভগবান বলে মান্‌লে, ঈশ্বর বলে মান্‌লে, সেখানে দয়া, কৃপা, করুণা, প্রার্থনা সবই যে যে রূপে তুমি স্থিত হ'বে সেই সেই আকারে তিনি প্রকাশ হ'বেন। যেমন দীন হ'লে দীন-দয়ালের প্রকাশ হ'ল।

যদি বল, তিনি করেন না, আবার করেনও, তাঁকে কর্ত্তা বানাচ্ছ তিনি ত অকর্ত্তা। তুমি নিজে কর্ত্তৃত্বাভিমানে আছ, তাই তাঁকে কর্ত্তা বলছ।

হ্যাঁ, তাঁকে যাই বল তাই তিনি। আবার দেখ না, যেখানে তৎ' কোন কর্ম্মে, কার কাছে কর্ত্তা হবেন ? তিনি স্বয়ং। তিনি পা নাই চলেন, চক্ষু নাই দেখেন, কাণ নাই শোনেন, মুখ নাই খান, সেই যে বল না, সে-ই।

সাধক যখন বিগ্রহ-পূজা আরম্ভ করে, ক্রমোন্নতিতে এক অবস্থায় ইহা হয়। 'যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।' এও আমার ঠাকুরের মধ্যে সমস্ত ঠাকুর আছেন। আমার ঠাকুরের মধ্যে সকলের ঠাকুর এবং সব আছে আর সকলের ঠাকুরের মধ্যে আমার ঠাকুর রয়েছেন এবং সব রয়েছে। আমার মধ্যেও এই ঠাকুর রয়েছেন ত, আর সকলের মধ্যেও এই ঠাকুরই ত ? জলে, স্থলে, গাছে, পাতায়, লতায়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমার ঠাকুর আছেন। আবার এই যে আকার প্রকার দেখা যাচ্ছে, এই আকার, এই রূপেতে কে ?—আমার ঠাকুরই ত, আর ত কেউ নয় ? ছোট থেকে ছোট, বড় হ'তে বড়।

তোমাদের নানা সংস্কার অনুসারে এক এক ঠাকুর যার যার তার ভার আলাদা। যার যতটা ভাব তার ততটা লাভ ত। যতটা উন্নত হ'বে ততটা তার ইষ্টমূর্ত্তিতে বিকাশ প্রকাশ পাবে সেই সেই অনুসারে। এক কালে আলাদা থাকবে না, ঠাকুর ধরা দিবে অনন্ত রূপেতে। নিজ সংস্কার বলে যখন প্রকাশ সর্ব্ব—হবে। আবার সর্ব্বেতে যখন নিজের সংস্কার ধরা পড়বে। সেও একটি

দিকের কথা। নিজেকেও আলাদা বাদ দিতে পাচ্ছ না।

এই যে নানারূপ পশু, পাখী, মানুষ ইত্যাদি সকল, এই সকলগুলি কি? আকার, প্রকার, প্রকাশটা কি ? রূপগুলি যে বদলিয়ে যায় সেইগুলিই বা কি? আস্তে আস্তে যেহেতু তার ঠাকুর আর সেই ভাবে বিভোর, তৎভাবে থাকে কি না - সর্ব্ব রূপেতে আমার ঠাকুর প্রকাশিত। বালুকণাও বাদ যায় না। জলে, স্থলে, মানুষে, উদ্ভিদে, পশুপক্ষীতে মাত্র সেই ঠাকুর বনেছে। এক এক জনের এদিকটাও খুলে যায়। সকলের এক রকম হ'য়ে প্রকাশ হয় না। অনন্ত কিনা, কাজেই কার যে কোন দিক্ দিয়া গতি ধরে সম্পূর্ণ প্রকাশ হ'বে সেটা সাধারণের অগোচর।

ভাগবত ব্যাখ্যা কালে গাছ, লতা, পাতা, পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, সাগর ইত্যাদি ভগবানের বিরাট শরীরের কথা ঐ যে শোনালে, দেখ একটা সময়ে এটা আসে, এই সর্ব্বটা, বিরাট শরীরের কথাটাও, একটা সময়ে এটা কিন্তু আসতেই হ'বে।

তিনি রূপে অনন্ত কি না, অন-অন্ত কিনা, কোন সংখ্যা দিতে পারে না। অতএব অনন্ত রূপ তাঁর, যত ইতিরূপ সৃষ্টি হ'চ্ছে, লয় হ'চ্ছে আমার সেই ভগবানের। এই এই ভাবেতে বিশেষ ভাবে যত বিস্তার হ'বে ততই অসংখ্য রূপেতে স্থিতি আসবে। অসংখ্যেতে নানা আকার, প্রকার, নানা রূপের প্রকাশে অন্তহীন, সংখ্যাহীন এবং অন্ত ও সংখ্যা। সেই স্থিতিতে সাধকের যখন প্রবেশ হয় তখন রূপের যে পরিবর্ত্তন, ভাবের যে পরিবর্ত্তন, এটার মধ্যে দৃষ্টি পড়ে। বিচার জাগরণ হয়, অর্থাৎ বিচার রূপেতে যে তিনি তার প্রকাশ হয়। সুকৌশল বলে যে কথাটা আছে না—সকলের যে চিন্তার ধারা জগৎমুখী—সেই চিন্তার ধারাটা ফিরে সুকৌশলে অর্থাৎ সেই স্বয়ং কৌশল রূপেতে যে বলেছেন তার প্রকাশ হয়। তখনই আচ্ছা এই যে পরিবর্ত্তনশীল জগৎ নিত্যই বদলে যাচ্ছে, নাই হ'য়ে যাচ্ছে, সেই নাই রূপেতে কে? নাইটা যেমন আছে আবার যখন যেরূপের প্রকাশটা সেটা না হ'লে পাবে কি করে? অন্তহীন রাজ্য, যেখানে তুমি নাই বলে দেখতে পাচ্ছ, নাই রূপটাও সত্য, তাঁরই একরূপ। যেখানে চিন্ময় রাজ্য — যখন যেরূপ নিত্য রয়েছে। কাজেই একজায়গায়, নাই ও আছেও যুগপৎ, নাইও না আছেও না, আরও চল্।

আচ্ছা, তা হ'লে আমার ঠাকর জল আর বরফ যেমন আছে। আমার ঠাকুরের কোন রূপ নাই, গুণ নাই, কোন প্রকাশের প্রশ্ন নাই। সেই স্থিতিতে যখন নিজকে পেল। ঠাকুর পাওয়া, নিজকে পাওয়া মানে ভগবানই ত আপন, এ আমার নিজস্ব নিজের। আর আত্মাই ত একমাত্র। তখন ইহার মধ্যে সময়োপযোগী ঋষিদের যেমন মন্ত্র দর্শন হ'ত তার ভিতর স্থানোপযোগী মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষিদের যেমন প্রকাশ, মন্ত্রের স্ফুরণ এবং বেদের পূর্ণাঙ্গীন যেখানে, যেটা প্রকাশ সেটা স্থানে স্থানে যার যার কর্ম্ম ভাব অনুসারে প্রকাশ হ'তে বাধ্য হয়। যখন রূপ অরূপের আকার সাধকের কাছে প্রকাশ হ'ল সর্ব্বাঙ্গীন ভাবেই ত। তাতে ভাবেব যে রূপ, শব্দ ব্রহ্মের যে যোগ—নানা জাতীয় ভাষা, অন্তহীন ভাষা, শব্দব্রহ্ম রূপেতেও। অনন্ত শব্দের আকার, প্রকার প্রকাশের দিকগুলি তার কাছে মূর্ত্ত হ'য়ে প্রকাশ হওয়া ত।—সমস্ত আকার সাদৃশ্য হ'য়ে প্রকাশ যেখানে। হ্যাঁ, আকারশূন্য, আকার যে শূন্য এইরূপ—জগৎ শূন্য রূপ প্রকাশ হ'য়ে মহাশূন্যে যায়। কারণ এই যে জগতের মধ্যে

শূন্য দেখতে পাচ্ছ এটা প্রাকৃতিক রূপ ত, কাজেই এই শূন্যটাও একটা রূপই। এই শূন্য হ'তে মহাশূন্যে যেতে হ'বে।

বোধ আসবে—যে বোধ তোমার জগৎ বোধে দেহ মন প্লাবিত করে এতকাল তাহাতে ভাসিয়ে বেঁধে রেখেছিল, সেই বোধগুলি বিশ্ববোধে পরিণত—বোধ-দেবরূপে প্রকাশ হ'লেন। বোধ-স্বরূপ—সর্ব্ববোধ 'স্বরূপ' যেখানে এসে গেল, স্বরূপেতে কি হ'লেন, ভাব। রূপ অরূপের বোধ অসংখ্য রূপেতে যেখানে প্রকাশ, যখন সমগ্র নির্ম্মূল। আকার, প্রকার প্রকাশ রূপের স্থান চ্যুত হ'য়ে অরূপের স্থিতিতে গেলেন, তখন কি বল্‌বে ?—পরমাত্মাই ত। জীবাত্মা যেখানে পর পর সেই সমগ্র বন্ধনরূপে সেই আবরণ মুক্ত কিনা —পরমাত্মা স্বরূপ। যেখানে স্বরূপ স্থিত—।

দেখ আর একটা কথা। যে যে লাইন ধরে চলে না। কারও কারও বেদান্ত লাইনে চল্‌তে চল্‌তেও ঋষি-পন্থা স্ফুরিত। আবার কাহারও কাহারও বিগ্রহাদির মধ্য দিয়াও ভজন পূজন যোগ ইত্যাদি লক্ষ্য করে চলার দিক্ দিয়ে যেয়েও ঋষি-পন্থা স্ফুরিত হ'তে পারে। আকাশ-বাণী ইত্যাদি যা বল না, সে সব বাণী শব্দ রূপেতে সম্পূর্ণ ভাষা ভাব যোজনা হ'য়ে প্রকাশ হ'তে হ'তে সেই বাণীতে নিজেতে অভিন্নত্বের দিক—স্বয়ং তিনি এই রূপেতে প্রকাশ। যে যে লাইনেই চলুক না কেন ঋষি-পন্থা ইত্যাদি সব কখন যে কোন আকারে, প্রকারে, প্রকাশে কাহার স্ফুরিত হ'বে। এমনই স্থান সাধারণের ধরা কঠিন।

আচ্ছা, এইস্থানে যে যে লাইন দিয়ে চল্‌ল— ঐ যে বলা হ'য়েছিল মূর্ত্ত রূপেতে, সেই মূর্ত্তি রূপেতে কি ?—না, অমূর্ত্ত আত্মরূপেতেও তিনি। আচ্ছা, তাহ'লে অমূর্ত্ত আত্মরূপেতেও তিনি, মূর্ত্ত রূপেতেও তিনি। যখন কেহ সহজভাবে বেদান্ত লাইনে আত্মস্থ। জলই যে বরফ সেটাও যাইতে পারে বিগ্রহের দিকটা। তখন দেখে সমস্ত বিগ্রহ —জলেতে বরফরূপে, চিন্ময়রূপে তিনি। বরফে কি আছে ?—জলই আছে। অতএব 'সর্ব্ব' এই যে আবরণ রূপেতে, পর্দ্দা রূপেতে, সে বরফেরই stage by stage থাকে না, হাল্কা বরফ, কঠিন বরফ। আবার যেখানে বিশুদ্ধ সেখানে কিন্তু stage by stage এর কোন প্রশ্ন নাই। বরফ যদিও গলবার দিক, বরফ হ'য়েও আছে ত, হ'তে পারে ত। অতএব বরফ রূপেতে যে আছে, সে জন্যই স্বয়ং, নিত্য অনিত্যের প্রশ্ন কোথায় ?

তাহ'লে তোমরা যে বল না দ্বৈতাদ্বৈত, এখানে দ্বৈতও বটে অদ্বৈতও বটে। যেমন তুমি পিতা, পুত্র, পতি। পতি না হ'লে পুত্র কোথায়, পুত্র না হ'লে পিতা কোথায় ? তাহ'লে কোনটাও কম ক'রে না। উচ্চস্তর এবং নিম্নস্তরের কোন প্রশ্ন নাই, সম। যেখানে উচ্চস্তর নিম্নস্তরের কথা সেখানে আছেই। যেটাই বল্‌বে সম্পূর্ণ। উপমা ত সর্ব্বাঙ্গীণ হয় না, যতটুকু ততটুকু বুঝিয়া লওয়া। অতএব জল আর বরফের নিত্যত্ব। তাই তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। যেখানে সাকার অর্থাৎ বরফের দিক্‌টা—নানা আকার, প্রকার, প্রকাশ চিন্ময় বিগ্রহ রূপেতে। এক এক দিক দিয়ে এক এক রূপ বিশেষ লক্ষ্য করে।

যেখানে সম্প্রদায়,—স্বয়ং ভগবান আপনাকে আপনাতে প্রদান কচ্ছেন, জীবের জীবত্ব চিনবার দিক। সে-ই—জল বরফ। বরফেতে কি ?—জলই। যেখানে দ্বৈতাদ্বৈত,—দ্বৈতও বটে, অদ্বৈতও বটে র্থাৎ রূপ আছে, রূপ নাই, এদিক্‌টা বোলে নিলে।

আবার এই যে দ্বৈতও বটে, অদ্বৈতও বটে, এ

ভাষায় ভাসে কোথায়? এরূপ স্থান ত আছে। ভেদও বটে, অভেদও বটে। আর সত্যি কথা তিনি ভেদ রূপেও, অভেদ রূপেও। এদিক্ দিয়েও জগৎ দৃষ্টিতে দেখ না, ভেদ ত মান্‌ছই। নিজেকে পাবার জন্য যেখানে চেষ্টা কচ্ছ ভেদ দৃষ্টি ত বটেই, নিজে আলাদা করে মান্‌ছ জগৎ দৃষ্টিতে। এদিক্ দিয়ে ভেদ ত পেয়েই যাচ্ছ। হ্যাঁ, জগৎ ত নাশের দিক, সত্যি কথা—স্ব না, সে না। নিত্য থাকছে না। এই রূপটাই বাকে, ভাব। আচ্ছা, যায় কি, আসে কি?—গতি দেখ না, সমুদ্রের দিকে স্বয়ং স্ব মুদ্রারূপে। এই যে তরঙ্গ, জলেরই ত ঢেউ, জলেতেই ত লয়। আর জলই ত ঢেউতে। তারই সব অঙ্গ ত ঐ জলে তরঙ্গ। জল–বরফ, ঢেউ হবারও মুলে কি?—এটাও ত একটা স্থানের কথা, ভেবে দেখ। উপমা সর্ব্বাঙ্গীণ হয় না। তবে জগৎ দৃষ্টিতেও দেখলে ত, আসলে কি পেলে, দেখ। যেখানে তুমি সাকার রূপেতে পেলে, নিরাকার রূপে পেলে। আবার তাকেই এই চিন্তায় ধরা যায় না, সেটাও তুমি পাবেই।

ইহার ভিতরে যে সকাম সগুণ রূপেতে প্রকাশিত নিত্য যিনি আছেন। আবার নিরাকার নির্গুণ–গুণ অগুণের কোনই প্রশ্ন নাই, শুদ্ধ অদ্বৈত। তোমরা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম বল না। শুদ্ধা দ্বৈত যেখানে সেখানে কোন রূপ, গুণ, ভাব, অভাব কোন প্রশ্ন দাঁড়ায় না। যদি বল এইটাই তিনি, এটাও তিনি, তবে ও'র মধ্যে রয়ে গেলে 'ও' আলাদা মেনে নিলে। সে, ও আর কোন প্রশ্ন নাই। সেই স্থিতিতে একমাত্র। যেখানে নির্গুণ ব্রহ্ম, গুণাগুণের প্রশ্ন নাই সেখানে একমাত্র আত্মা। দেখ, যেখানে স্বগুণ, সাকার, রূপেতে মানছে। একাগ্র সেই আকার রূপেতে, এখানে আর অরূপের কথা দাঁড়াবে না—এই একটা স্থিতি। সেখানে স্বগুণও বটে, নির্গুণও বটে, সেখানেও একটা স্থিতি। চিন্তা ক'রে বাহির করা যায় না—সেই যে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সেও একটা স্থিতি। আবার যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ইত্যাদির দিক দিয়ে এল এই যে বলা হ'ল সব সেই স্থিতিতে সেই সেখানে পূর্ণ, পূর্ণের থেকে পূর্ণ গেলেও পূর্ণই থাকে। বাদ দিয়ে কিন্তু নয় সম্পূর্ণ নয়, বাদাবাদী তাঁর মধ্যেই। যে লাইনেই যে চলুক রকমারী ভিন্ন মাত্র। সবটার মধ্যেই মন্ত্র আছে, ভাব আছে, ত্যাগ আছে, গ্রহণ আছে, পাবে কি?—সেই নিজেকেই ত। নিজ কে?—প্রভু দাস, পূর্ণ অংশ, আত্মা যে যে লাইনে চল স্বয়ং তাঁকেই পাওয়া নিজেকে পাওয়া।

দেখ, স্বয়ং ভগবান যেখানে মান্‌লে সেখানে ভগবৎ শক্তি। ভগবতী-ভগবান—স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ হিসাবে দেখছ ত। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের প্রশ্ন ত থাকে না। সে স্থানও ত আছে, আবার আলাদা আলাদা ক'রে পাওয়া যায় সে স্থানও আছে। কুমারী কাহারো অধীন নয়—সে স্বয়ং সেই ঐ শক্তিরূপিণী। শক্তিই যেখানে মান্‌লে সেখানে কি, না সত্তা রূপেতে। স্বরূপা এবং অরূপা, শুধু শক্তিই তাঁর এক রূপ, এও কিন্তু। যেখানে ভাব আর ক্রিয়ার প্রকাশ সেখানেই রূপের ····· প্রকাশ —এও। আবার শক্তিরূপেই যদি বলি স্বয়ং ভগবতী, তাঁর যে অনন্ত শক্তির প্রকাশ রয়েছে। আবার মহাশক্তি যাহা মূল, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। বৃক্ষের মত, শাখা, প্রশাখা মূল হইতে সেরূপ শাখা প্রশাখা·····কত দেবতা দেবী, সেই শক্তির নানা প্রকাশ। শিবের শিবত্ব, নির্ব্বিকার সব, মানে মৃত্যুর মৃত্যু যেখানে সেখানে অমৃত, নাম শিব। সৃষ্টি স্থিতি, লয় যেখানটায় পাচ্ছ, সৃষ্টি রূপেতে সেই হ'চ্ছে, স্থিতি রূপেতে সেই স্বয়ং মহাবিষ্ণুর

দিক যা বল। আলাদা আলাদা স্থান হিসাবে স্বয়ং সেই সেইরূপ, প্রকাশ নানা ভাবে এবং অরূপে। একেতে অন্য সবই; বিভিন্নেতে সেই এক দেখ। যেমন একরূপ দেখলে অন্য রূপ দেখতে পাওনা। কিন্তু এক এক রূপেতেই সর্ব্ব, সর্ব্ব রূপেতেই সেই এক। শূন্যেতে পূর্ণ, পূর্ণেতে সেই শূন্য। রকমারী দিক—মূল, সেই ত প্রকাশ স্থল। অন-অন্ত—এক এক দিক দিয়ে বলতে গেলেও অন্ত কোথায় হ'বে। যতটুকু ততটুকু অন্তেরও দিক। সত্তারূপে কি? সেই আত্মা পরমাত্মা যা' বল। ভগবান যেখানে মানলে, ভগবৎ শক্তি মানলে, ঈশ্বর, ঐশ্বরীয়, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি ত তিনিই। আচ্ছা, তা'হলে ভগবান অকর্ত্তা। কেন না তিনি ত কোন ক্রিয়া করেন না। কার্য্য করেন তবেই না তার কর্ত্তা। সর্ব্ব কার্য্য কারণ রূপেতে যিনি স্বয়ং, কার্য্য কারণের কর্ত্তা, অকর্ত্তার প্রশ্ন কোথায়? অতএব তিনি এখানে অকর্ত্তা। তাঁহার মায়া যেখানে, ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বরীয় শক্তির বিকাশ প্রকাশ যেখানে, যন্ত্র রূপেতে সেখানে সেই প্রকাশটি কে?—সেই ত হ্যাঁ। চল, অচল, তোমাদের যে একদেশ দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে আবরণ রূপেতে। কর্ত্তা অকর্ত্তা রূপেতে তোমরা যা বলছ—তোমরা কর্ত্তা অকর্ত্তা রূপেতে যেখানে নিবদ্ধ বনেছ সেই দৃষ্টিতে ভিন্ন আসা স্বাভাবিক—যা বল তাই। অতএব সেই ভাবেতে সেরূপ দেখাটা। দৃষ্টি সৃষ্টির ভঙ্গিতে।

আবরণ পর্দ্দা যতক্ষণ, ততক্ষণ এই যে একদিক দেখা, শোনা—এইটা নষ্ট না হ'লে ঐ প্রকাশ কোথায়? অতএব নাশ, নাশে যা এত সব দিক রূপেতে আছেন সেই তিনি। আচ্ছা, এই যে নানা সম্প্রদায়, নিজেকে তিনি প্রদান করবেন বলে সুন্দর এক একটা ধারায় আছেন তাহার ভিতরে কথা হ'ল এই—তিনি স্বয়ং সর্ব্বরূপে, অরূপে, নানা ভাবে প্রকাশিত। রাস্তারূপেতে যার যে সংস্কার সেই অনুসারে পন্থা অবলম্বন ক'রে তিনিই তাঁকে আকর্ষণ কচ্ছেন। নানা দিক—সম্প্রদায় রূপে দাঁড়িয়ে। যদি কোথায়ও কোন স্থানে তোমাদের বিরোধ হয় বলে যা বলেছ যাহা তোমাদের সংশয়। এ শরীর ত কিছুই বাদ দেয় না। এক এক সম্প্রদায়ে যেখানে গেলে তার সবটাই প্রকাশ হ'বে। অতএব এক একটি দিক দিয়ে অর্থাৎ সম্প্রদায় দিয়ে আলাদা বলে তোমরা মনে যে দ্বন্দ্ব অনুভব কচ্ছ, ইহাত হ'তে পারে যে লাইন দিয়ে যে পূর্ণাঙ্গীণ প্রকাশ তিনি সেই সম্প্রদায়ে যা বলে গিয়েছেন ঐখানে গেলে হ'তে পারে বাকীটা আপনিই প্রকাশ হ'য়ে যাবে। সম্প্রদায়ে এও ত হ'তে পারে।

এই যে বল্লে, এটা ত রাস্তা, একটা স্থিতি। হ্যাঁ এত সত্য কথা, এতটুকুই যদি প্রকাশ থাকে তা'হলে ত হ'ল না। কারণ বিরোধ ভঞ্জন, সেই রূপ প্রকাশটা চাই ত। যেখানে নির্ব্বিরোধ পূর্ণাঙ্গীণ প্রকাশ। সেটা না হ'লে ততটুকু মাত্র প্রকাশ হ'লে ত হ'ল না। যে প্রকাশে কারও সঙ্গে বিরোধ থাকে না। সম্পূর্ণ যত ইতি মত, পথ-সম-অগ্র। সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ যেখানে। বিরোধ ত আর স্থিতি নয়। হ্যাঁ এক নিষ্ঠায়—ইষ্ট নিষ্ঠার জন্য যার যার লাইনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ বিচারে চলা উচিত।

কর্ম্মফলের দিক দিয়েও দেখনা যে দিকে যে ভাবে অখণ্ড লক্ষ্যে অখণ্ড কর্ম্ম, সেখানে কে হচ্ছেন প্রকাশ? সেই অখণ্ডই ত। অথচ কর্ম্ম মাত্রেই সেই অখণ্ড স্বয়ং প্রকাশ আছে যার তাহারই জন্য, চেষ্টা জীব স্বভাবতঃ করে যাচ্ছে। স্বভাবেই স্বভাবের কর্ম্ম, স্বভাবেই স্বভাবের কর্ম্মের টান। স্বভাব, স্ব স্বয়ং আত্মা বল, যা' বল, তিনিই আমিই।

---

# ব্যাখ্যা

সতের

১। অহেতুক কৃপা—

কৃপা বাস্তবিক পক্ষে স্বাভাবিক হইলেই 'কৃপা'-নামের যোগ্য হয়। যদি অতীতের সঙ্গে কোন যোগ থাকে, অর্থাৎ যদি প্রাক্তন কর্ম্মের ফল স্বরূপে ইহার প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ইহাকে বিশুদ্ধ কৃপা বলা চলে না। সেই প্রকার যদি ভবিষ্যতের সঙ্গে যোগ থাকে, অর্থাৎ ভবিষ্যতের কোন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য যদি কৃপার প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সেই কৃপাও প্রকৃত 'কৃপা'-পদবাচ্য নহে। যাহা স্বাভাবিক তাহা স্বভাব হইতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে—তাহার সঙ্গে পূর্ব্বের অথবা পরের কোন যোগ-সূত্র থাকে না। কিন্তু প্রকৃত কৃপা সকল ভূমি হইতে প্রকাশিত হইতে পারে না। ইহা নিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র, তাই একমাত্র সেই পূর্ণ স্থান হইতেই ইহার প্রকাশ সম্ভবপর। নিম্নভূমি হইতে যাহা কৃপারূপে প্রকাশিত হয় তাহা কৃপা হইলেও সাপেক্ষ, কারণ যাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শিত হয় তাহার কোন প্রকার যোগ্যতা অবলম্বন করিয়াই সাপেক্ষ কৃপা প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহাই কৃপার বীজ। উহা কোন আধারে লক্ষিত না হইলে সাপেক্ষ অধিকারী পুরুষ কৃপা প্রদর্শন করিতে পারেন না। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। বিশ্ব লৌকিক দৃষ্টিতে দ্বৈত-ভাবময়, সুতরাং উচ্চ এবং নিম্ন ও মহান্ এবং ক্ষুদ্র, এই প্রকার ভেদ ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। যে নিজকে মহান্ বলিয়া মনে করে সে ক্ষুদ্রকে নিজ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে এবং যে নিজকে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ করে সেও মহান্ হইতে নিজকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে। এই স্থলে যে মহান্ সে ক্ষুদ্রের উপর স্বভাবতঃই কৃপা-পরায়ণ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার কৃপা প্রকৃত প্রস্তাবে তখনই কার্য্যে পরিণত হয় যখন ক্ষুদ্র উহা ধারণ করিতে পারে। কারণ কৃপা ধারণ করিতে না পারিলে উহা না পাওয়ারই সমান হয়—উহা দ্বারা অভাব মোচন হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রের অন্য যোগ্যতা না থাকিলেও মহানের প্রদত্ত কৃপাকে ধারণ করিবার যোগ্যতা থাকা চাই। কিন্তু যদি কোন স্থলে ক্ষুদ্র ঐ কৃপা ধরিতে না পারে তাহা হইলে মহানের কৃপা এক প্রকার ব্যর্থই হইয়া গেল বলিতে হইবে। তিনি কৃপা করিয়াও কৃপা না করার মতনই থাকেন। ইহার একমাত্র কারণ এই—তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ। অগ্নি যেমন ইন্ধনকে আশ্রয় করিয়া প্রজ্বলিত হয় এবং ইন্ধনকে আশ্রয় করিতে না পারিলে অগ্নির প্রকাশ সম্পন্ন হয় না, তদ্রূপ সাপেক্ষ কৃপাও জানিতে হইবে। একমাত্র পরম বস্তু ভিন্ন নিরপেক্ষ কৃপা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।—সাপেক্ষ কৃপা এক হিসাবে প্রকৃত কৃপাই নয়। ইহা বীর্য্যহীন, নিস্ফল ও নাম মাত্রে পর্য্যবসিত। প্রকৃত কৃপা তাহাকেই বলে যেখানে কোন উপাধি নাই। নিরপেক্ষ কৃপা স্বতন্ত্র। উহা কিছুর উপরই নির্ভর করে না। কৃপা-পাত্রের কৃপা-ধারণের যোগ্যতা না থাকিলেও নিরপেক্ষ কৃপার প্রভাবে আপনিই ঐ যোগ্যতা অভিব্যক্ত হয়। বস্তুতঃ উহা একাধারে কৃপা করাও বটে এবং কৃপা ধারণ করাও বটে—মহানরূপে কৃপা করা এবং ক্ষুদ্ররূপে ঐ কৃপা ধারণ করা, উভয়ই নিরপেক্ষ কৃপা হইতে ঘটিয়া

থাকে। ইহাই প্রকৃত অহেতুক কৃপা। ভগবৎ-কৃপা এই অহেতুক কৃপার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা পূর্ব্ব কর্ম্মের অপেক্ষা রাখে না, ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টিপাত করে না, ধারণকারীর ধারণশক্তির অথবা যোগ্যতার উপরে নির্ভর করে না। ইহা প্রকাশিত হইলে নিজ মহিমায় নিজের সফলতা ফুটাইয়া তোলে। ইহা স্বাতন্ত্রেরই নামান্তর। গ্রহণকারীর ইচ্ছার সঙ্গে দানকর্ত্তার ইচ্ছার যোগ হইলেই কৃপা সফল হয়। দানকর্ত্তা পূর্ণ হইলে তাঁহার ইচ্ছার প্রভাবে গ্রহণকর্ত্তাতেও অনুরূপ ইচ্ছা জাগ্রত হয়। মা যশোদা যখন মাখন তুলিয়া গোপালের মুখে দিবেন বলিয়া মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করিতেন অমনি কোথা হইতে গোপাল ছুটিয়া আসিয়া 'মা, মাখন দাও' বলিয়া মাখনের জন্য মাকে পীড়ন করিতেন। যশোদার দিবার ইচ্ছা ছিল বলিয়াই গোপালের ভিতরে নিবার ইচ্ছা জাগিত অথবা গোপালের মাখন নিবার ইচ্ছা ছিল বলিয়াই যশোদার মনে মাখন খাওয়াইবার ইচ্ছা জাগিত। একই সত্যের দুইটি দিক্ মাত্র। যিনি স্বয়ং ভগবান্ তিনি কৃপা করিলে কোন বিশেষ কারণে জীব তাহা প্রাপ্ত হইবে না তাহা হইতে পারে না। জীবের অযোগ্যতা যতই থাকুক নিরপেক্ষ ভগবৎ-কৃপাতে তাহার গণনা হয় না। ইহার একমাত্র কারণ দাতা ও গ্রহীতা অভিন্ন। দাতা তাহা জানেন। তাঁহার দৃষ্টিতে সমস্ত বিশ্বই তাঁহার সহিত অভিন্ন। তাই এই অদ্বৈত-ভূমি হইতে কৃপার সঞ্চার হইলে তাহা একদিকে অর্থাৎ দাতার দিকে কৃপা-প্রকাশের যোগ্যতা নিয়া এবং অপর দিকে অর্থাৎ গ্রহীতার দিকে উহা ধারণ করিবার যোগ্যতা নিয়া আবির্ভূত হয়। অপূর্ণ ভূমি হইতে কৃপার প্রকাশ হইলে উহার সফলতার জন্য দেশ, কাল ও ধারকের যোগ্যতা প্রভৃতি আবশ্যক হয়। কৃপাকারী অপূর্ণ বলিয়া ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অপেক্ষিত হয়। এইজন্যই ভগবৎ-কৃপা যে অহেতুক তাহা সিদ্ধান্ত রূপে মা গ্রহণ করিয়া নিজে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যে নিত্য-সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন তাহা স্বাভাবিক বলিয়া কর্ম্ম প্রভৃতির উপর নির্ভর করে না। অদ্বৈত ভাবের মধ্যে সকল ভাবই গুপ্ত রহিয়াছে। সবই স্ব-ভাবের অন্তর্গত, হেতুর স্থান কোথাও নাই। জীবের ইচ্ছার মূলেও যে সেই মহাইচ্ছার খেলা রহিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মহাযান বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে কৃপা অথবা করুণা তিন প্রকার—সত্বাবলম্বন, ধর্ম্মাবলম্বন এবং নিরবলম্বন। সকল জীবের দুঃখ-সাক্ষাৎকার হইতে যে করুণার উদ্রেক হয় তাহাকে সত্বাবলম্বন করুণা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু এমন দৃষ্টিও আছে যে-দৃষ্টিতে জীবের দুঃখ-সাক্ষাৎকার আবশ্যক হয় না, কিন্তু জগতের নশ্বরত্ব অথবা ক্ষণিকত্ব দর্শন হইতেই করুণার উদ্দীপন হইয়া থাকে। ইহার নাম—ধর্ম্মাবলম্বন করুণা। ইহা প্রথম প্রকারের করুণা হইতে উৎকৃষ্ট। কিন্তু যাহার দৃষ্টি অত্যন্ত নির্ম্মল তাহার করুণা সত্বগণের দুঃখ দেখিয়া হয় না জগতের নশ্বরত্ব-সাক্ষাৎকার করিয়াও হয় না। ঐ করুণার কোন অবলম্বন নাই—উহা নিরালম্ব বা নিরুপাধিক করুণা অর্থাৎ উহার নামান্তর স্বাভাবিক করুণা। উহা স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ। উহা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। যখন নিরালম্ব পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন প্রজ্ঞা নিরালম্ব হইয়া প্রজ্ঞাপারমিতা রূপে পরিণত হয় এবং কৃপাও নিরালম্ব হইয়া মহাকৃপা রূপ ধারণ করে। তখন শূন্যতা এবং

করুণা অভিন্ন হয়। ইহারই জন্য প্রমাণবার্ত্তিককার বলিয়াছেন—

নিরালম্বপদে প্রজ্ঞা নিরালম্বা মহাকৃপা।
একীভূতা ধিয়া সার্দ্ধং গগনে গগনং যথা॥

আমরা যে অহেতুক কৃপার আলোচনা করিতেছিলাম ইহাই সেই অহেতুক কৃপা।

২। জীবের কর্ত্তৃত্ব বোধ ও তাহার দায়িত্ব—

মা বলেন, জীব যাহা কিছু পাইয়াছে সবই সেই পরম স্থান হইতেই পাইয়াছে। যে কর্ত্তৃত্ব বোধ বা স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে বলিয়া জীব-জগতে তাহার বৈশিষ্ট্য তাহাও সে সেই মূল স্থান হইতেই পাইয়াছে। বস্তুতঃ জীব স্বয়ংই সেই স্থান হইতে আসিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—ইহার উদ্দেশ্য কি? জীবের শক্তি, জীবের স্বরূপ, সবই এই ভাবে দেখিতে গেলে আগন্তুক মনে হয়। কিন্তু মা বলেন, ইহার একটি গভীর উদ্দেশ্য আছে। বস্তুতঃ সেই মূল স্থানে জীব নিজেই আসীন। কিন্তু জীব যখন সেই মূল স্থানে ছিল তখন জীব নিজকে নিজে চিনিত না। সে ভগবানেই ছিল অভিন্নভাবে, কিন্তু সে বোধ তাহার ছিল না। কারণ একটা গভীর আবরণে ঐ বোধ আচ্ছন্ন ছিল। আশ্চর্য্য এই যে আবরণের বোধও তাহার ছিল না। তাই ভগবান্ তাহাকে একটা পৃথক্ বোধ দিয়া যেন নিজ হইতে পৃথক্ করিয়া বাহির করিয়াছেন। এই পৃথক্ বোধের সঙ্গে একটা স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্ব-অভিমানও দিয়াছেন। জীবের কর্ত্তব্য, এই 'কর্ত্তাভাব'-টিকে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা, তাঁহাকে পাওয়ার কার্য্যে বিনিয়োগ করা। তবেই ইহার সার্থকতা। তখন তাঁহাকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পাওয়া যাইবে, সকল অভাব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি ঐ ভাবটি অন্য ভাবে প্রয়োগ করা হয়, অর্থাৎ 'তিনি দূরে আছেন ও তাঁহাকে পাওয়া যায় না' এইরূপ ভাবনার আশ্রয় নেওয়া হয় তাহা হইলে ভগবৎ-প্রদত্ত স্বাধীনতা-শক্তির অপব্যবহার করা হয়। এই ভাবে কর্ম কি ও অকর্ম কি তাহা মা বুঝাইয়াছেন। তাঁহাকে পাইলে অর্থাৎ নিজকে পাইলে কর্ম থাকে না, অকর্মও থাকে না। কিন্তু না পাওয়া গেলে যদি নিজের সর্ব্বশক্তি তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় ও বিশ্বাস রাখা হয় যে তিনি মোটেই দূরে নন ও তাঁহাকে অবশ্য পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে জীবের কর্ত্তৃত্ব-অভিমান সফল হয়। তখন জীব কৃতকৃত্যতা লাভ করে।

৩। চাওয়া ও পাওয়া সমসূত্র—

গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"

ইহার তাৎপর্য্য এই, যে তাঁহাকে যেভাবে চায় তাহাকে তিনি সেইভাবেই অনুগ্রহ করেন। মাও তাহাই বলেন—"যেখানে ভগবান্ ব'লে মানলে, ঈশ্বর ব'লে মানলে, সেখানে দয়া, কৃপা, করুণা, প্রার্থনা সবই যে যে রূপে তুমি স্থিত হবে সেই সেই আকারে তিনি প্রকাশ হবেন।" ভগবান্ সর্ব্বাতীত হইয়াও সর্ব্বময়। তিনি আপ্তকাম। তিনি পূর্ণ। তাঁহার কোন অভাব নাই। কিন্তু জীব অপূর্ণ, গণ্ডীবদ্ধ ও কামনার অধীন। কিন্তু সে যদি ভাবনা-সূত্রে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হয় তাহা হইলে ঈশ্বর এই যোগভাবনার ফলে স্বভাবতঃ ইচ্ছাহীন হইয়াও জীবের ইচ্ছানুসারে ইচ্ছাময় রূপে প্রকাশিত হন। ইহার প্রভাবে জীবের অভাব দূর হয়, তাহার ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে; তাই বলা হয়—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' তাই সর্ব্বত্র তাঁহারই প্রকাশ বিচারে রাখিতে মা বলেন। বিচার

ও ভাবনা একই বস্তু। সর্ব্ব বস্তুতে তাঁহার প্রকাশ ভাবনা করিতে পারিলে সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রকাশ ফুটিয়া উঠে—আবরণ সরিয়া যায়। তখন জীবের ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছারূপে ভাসিয়া উঠে। ইহারই নাম করুণা।

৪। যতটা ভাব ততটা লাভ—

অনেকে ভ্রম বশতঃ মনে করে, দেবদেবীর মধ্যে তারতম্য আছে। যতদিন ভ্রম না কাটে ততদিন আপন আপন প্রাক্তন সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে রুচিগত পার্থক্য বশতঃ এই ভেদ-জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। ইহা জীবের ভেদ-ভাবনার ফল। কিন্তু বস্তুতঃ এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সর্ব্বত্র এককে দেখাই অভ্যাস করা উচিত। সুতরাং উপাস্য বা ইষ্টগত কল্পিত উৎকর্ষের উপর নিজের সাধনার উন্নতি নির্ভর করে না। উৎকর্ষ বা অপকর্ষের তুলনামূলক বিচার না করিলেই ভাল হয়। যাহার ইষ্ট যে মূর্ত্তিই হউক না কেন তাহার ভাব ও সাধনাগত উৎকর্ষের পরিমাণ ঐ মূর্ত্তি মধ্যেই ফুটিয়া উঠে। সময়ে এমন একটি অবস্থার উদয় হয় যখন ঐ এক মূর্ত্তিতেই ভগবানের বিশ্বরূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহা মূর্ত্তির উৎকর্ষ বশত: নহে, কিন্তু সাধকের ভাবনার উৎকর্ষ বশতঃ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫। বিরাট্ শরীর—

ভাগবতে, গীতাতে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে ভগবানের বিরাট্ শরীরের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। জগতের যাবতীয় বস্তুই ঐ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তিনটি কাল এবং সমস্ত দেশ ঐ শরীরে একীভূত। ইহা অর্থাৎ ভগবানের এই বিরাট্ শরীর লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা একমাত্র দিব্য-চক্ষুতেই ধরা পড়ে। এই দিব্য চক্ষু মানুষ নিজের সাধন-বলেও পাইতে পারে। তখন ইহা হয় তাহার স্বোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য, আবার ইহা একমাত্র ভগবানের কৃপার প্রভাবেও উপলব্ধি-গোচর হইতে পারে। যে কোন প্রকারেই হউক দিব্য চক্ষুর উন্মেষ হইলেই দিব্য দৃষ্টির উন্মীলন হয়। তখন সাধকের দৃষ্টি হইতে কালগত ও দেশগত ভাবে জগতের কোন বস্তুই গুপ্ত থাকিতে পারে না। এই বিরাট্ শরীরের দর্শন প্রতি সাধকের জীবনে কখনও না কখনও অবশ্যই হয়। তাহা না হইলে সাধকের পক্ষে বিশ্ব হইতে বিশ্বাতীতে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। মার্গ-মধ্যে প্রক্রিয়াগত ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু যখন সর্ব্বাবরণ মুক্ত হইয়া যায় তখন এক অখণ্ড সত্তারই প্রকাশ হয়। তখন ভেদ থাকিতে পারে না অথবা যাহা থাকে তাহা অদ্বয় পরম তত্ত্বেরই আভাস রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। মা বলিয়াছেন, "একটা সময়ে এটা কিন্তু আসতেই হবে"। বুদ্ধদেব সম্যক্-সম্বোধির পূর্ব্বে এই প্রকার দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তখনকার বর্ণনা করিতে গিয়া কবিবর অশ্বঘোষ বলিয়াছিলেন, "দদর্শ নিখিলং লোকম্ আদর্শ ইব নির্ম্মলে।" অর্থাৎ নির্ম্মল দর্পণে যেমন বাহ্য দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হয় তদ্রূপ এই মহাজ্ঞানে সমগ্র বিশ্ব একই সঙ্গে যুগপৎ ফুটিয়া উঠে। এই পর্য্যন্ত অনুভব সম্পন্ন না হইলে বিশ্বের অতীত সত্তাতে প্রবেশ করা যায় না।

৬। অন্তহীন, সংখ্যাহীন এবং অন্ত ও সংখ্যা—

শুনিতে পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হইলেও ইহা সত্য যে যাহা অন্তহীন তাহাই অন্ত এবং যাহা সংখ্যাহীন তাহাই সংখ্যা। অর্থাৎ মহাশক্তির রাজ্যে অনন্ত ও অন্ত একার্থবাচক। অনন্ত বলিতে বুঝায় যে গতির শেষ নাই এবং সমাপ্তি নাই, অন্ত বলিতে বুঝায় তাহাই প্রকৃত অন্তস্বরূপ। ইহার তাৎপর্য্য

এই যে বিক্ষিপ্ত চিত্ত যখন বিক্ষেপ পরিহার পূর্ব্বক এক-ধর্ম্ম-গ্রাহিরূপে আভাসনান হয় তখন সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই এক ধর্ম্মেরই গ্রহণ হয়। তখন দেখা যায় সেই একই বস্তু পর পর অনন্ত রূপেতে ফুঠিয়া উঠিতেছে। সুতরাং বিক্ষিপ্ততার অভাব বশতঃ একদিকে যাহা অন্ত অন্যদিকে শক্তির প্রভাবে তাহারই অনন্ত রূপ। সুতরাং অনন্ত যেমন সত্য, অন্তও তেমনি সত্য। তদ্রূপ সংখ্যাহীন যেমন সত্য, সংখ্যাও তেমনি সত্য।

৭। সুকৌশল—

গীতাতে ভগবান্ কর্ম্মের সুকৌশলকেই 'যোগ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্"। মা বলেন, মানুষের চিন্তা সাধারণতঃ বহির্মুখী বলিয়া তাহার নিকট জগতের প্রকাশ হয়, কিন্তু সেই ধারাটি অন্তর্মুখ হইলে সর্ব্বত্র সেই একেরই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ধারাকে অন্তর্মুখী করাই মায়ের বর্ণিত সুকৌশল। অর্থাৎ দৃশ্য যখন যে কোন আকারেই প্রকাশিত হউক উহা সেই একেরই প্রকাশ ইহা মনে রাখিতে হইবে। প্রথম প্রথম ইহা ভাবনা দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হইবে। তাহার পর উহা আপনা-আপনিই ভাসিয়া উঠিবে। ভগবান্ সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও এই কৌশলের অভাবে তাঁহার আবরণ মুক্ত হয় না এবং তিনি অনুগত ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন না। জীবের কিঞ্চিৎ পুরুষকার প্রযুক্ত না হইলে এই আবরণ-উন্মোচন-ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে না। সর্ব্বত্র অর্থাৎ প্রতি দৃশ্যের পৃষ্ঠ-ভূমিতে এবং সর্ব্বদা প্রতি ঘটনার অন্তরালে একমাত্র সেই মহাপ্রকাশকেই দেখিতে চেষ্টা করা উচিত। ইহাকেই উত্তম কৌশল বলে।

৮। নাই ও আছে একেরই রূপ—

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। জগতের অন্তর্ভুক্ত কোন বস্তুই স্থায়ী নয়। উহা নিরন্তর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার ফলে যাহা 'আছে' তাহা 'নাই' হইয়া যাইতেছে। কারণ অনাগত হইতে কালের প্রবাহ আগত হইয়া বর্ত্তমানকে অতীতের কুক্ষিতে লীন করিয়া দিতেছে। কিন্তু অতীত হইলেও তাহাকে 'নাই' বলা যায় না, কারণ উহাও তো আছে। উহা অব্যক্ত রূপে স্থিত। 'নাই'রূপে বর্ণনা করিলে উহা সৃষ্টির একটি দিকেরই বর্ণনা করা হয়। সুতরাং অখণ্ড রাজ্যে উহারও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। তদ্রূপ যাহাকে চিন্ময় রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহাতে সকল বস্তুই নিত্য বর্ত্তমান। কোন বস্তুই পরিণামশীল নহে, অথচ অনন্ত ক্ষণিক প্রকাশে ঐ মহাপ্রকাশ অভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। ইহারও একটি স্তর আছে। পূর্ণের মধ্যে এই 'নাই' ও 'আছে' উভয়েরই সমান স্থান রহিয়াছে। পূর্ণ 'নাই' এবং 'আছে' উভয়ের অতীত হইয়াও উভয়াত্মক। বস্তুতঃ এই বর্ণনা দ্বারাও পূর্ণের সঠিক পরিচয় দেওয়া যায় না। তাই মা বলিয়াছেন "এক জায়গায় নাই ও আছে যুগপৎ, নাইও না আছেও না—আরও চল।" ইহা বলিয়া মা এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে ভাষার রাজ্য পার হইয়া আগে না গেলে পূর্ণ সত্যের ঠিক ঠিক সন্ধান হৃদয়ে ধারণা করা যায় না।

৯। মহাশূন্য—

আমরা সাধারণতঃ শূন্য শব্দের দ্বারা নিরাকারকে লক্ষ্য করিয়া থাকি, অর্থাৎ আকার-শূন্য বলিতে আমরা আকার-বর্জ্জিত কোন একটি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আকার-শূন্য শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে আকারও শূন্য অর্থাৎ আকারকে

অপসারিত করিয়া শূন্যকে লাভ করা নহে। কিন্তু আকার থাকা সত্ত্বেও আকারের মধ্যেই নিরাকারকে লক্ষ্য করিয়া নিরাকারের গ্রহণ করা। ইহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আকার না থাকিলে সেই অতীত আকারকে লক্ষ্য করিয়া নিরাকারের চিন্তা প্রকৃত শূন্য-চিন্তা নহে। উহা স্পষ্টভাবে আকারের চিন্তা না হইলেও প্রকারান্তরে আকারেরই চিন্তা; কারণ যে আকার জানে না সে এই জাতীয় আকারহীন বা শূন্য জানিতে পারে না। মানুষের মন যতক্ষণ প্রকৃতি-রাজ্যে ক্রিয়াশীল থাকে ততক্ষণ প্রকৃত শূন্য তাহার পক্ষে ধারণা করা সুকঠিন। মা এই শূন্যকে "প্রাকৃতিক রূপই" বলিয়াছেন। এই প্রাকৃতিক শূন্য ভেদ করিতে না পারিলে মহাশূন্যে প্রবেশ অসম্ভব। মহাশূন্যই প্রকৃত অরূপ, প্রাকৃতিক শূন্য সংস্কারাত্মক রূপ মাত্র।

১০। বোধ-দেবরূপে প্রকাশ—

সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ এমন একটি অবস্থার উদয় হয় যখন বোধের রূপান্তর হইয়া যায়। সাধারণ মানুষ সর্ব্বদা যে বোধে যুক্ত রহিয়াছে তাহা তখন অন্য প্রকার রূপ ধারণ করে। পূর্ব্বের বোধ তাহার দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়কে জগদ্ভাবে ভাবিত করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যখন নিজের কর্তৃত্ব-অভিমান পরিত্যক্ত হওয়ার পরে এক অনন্ত মহাশক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত হয় তখন তাহার সকল বোধই বিশ্ব-বোধের অঙ্গ বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। তাহার খণ্ড ভাব চলিয়া যায় এবং সমগ্রের সঙ্গে যোগে সে নিজেকেও সমগ্রেরই এক অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারে। এই বোধ খণ্ড জীব-বোধ নহে, ইহা অখণ্ড বিশ্ব-বোধেরই একটা তরঙ্গ বা ভঙ্গিমাত্র। ইহাকেই মা বলিয়াছেন, "বোধদেব।" এই বোধই দেবতারূপ—ইহা চিৎ-শক্তিরই একটি উল্লাস মাত্র। আগম শাস্ত্রে আছে যে, উচ্চাধিকার-সম্পন্ন সাধক বাহিরে কোন আচার্য্য হইতে চৈতন্যময় জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলেও তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান চৈতন্যরূপে পরিণত হইয়া তাহাকে দীক্ষিত করিতে পারে। এই অবস্থায় তাহার ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্মুখ হইয়া তাহার আত্মস্বরূপে মিলিত হইয়া চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন এই সকল ইন্দ্রিয়-শক্তি 'সংবিদ্-দেবী'রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই সকল দেবী নিজের স্বরূপ-চৈতন্য দ্বারা তাহাকে প্লাবিত করিয়া অভিষিক্ত করিয়া ফেলে। মা যাহাকে বোধ-দেবরূপে প্রকাশ বলেন তাহা কতকটা ইহারই অনুরূপ। এই অবস্থায় রূপ ও অরূপের বোধ অসংখ্য প্রকারে নিজ-বোধ-রূপে প্রকাশমান হয়।

১১। ঋষি পন্থার স্ফুরণ—

যে যে রাস্তা ধরিয়াই চলুক না কেন সেইটা তাহার নিজের রাস্তা কিনা তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু তথাপি ঐ রাস্তায় চলা তাহার বৃথা যায় না। চলিতে চলিতে কোন সময়ে তাহার নিজের রাস্তা খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। কোন মানুষ তাহার নিজ সংস্কারের সহিত সঠিক ভাবে পরিচিত নহে। এইজন্য যে কোন রাস্তায়ই চলুক না কেন চলিতে চলিতে তাহার নিজ সংস্কার জাগিয়া উঠিলে তাহার নিজের রাস্তা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন ঐ রাস্তা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া যায়। তাহাকে বৃথা পরিশ্রম করিতে হয় না। এইজন্য বেদান্তের ধারাতে সাধন জীবন আরম্ভ করিয়াও ঐ ধারা ঋষি-ধারাতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। এইরূপ সকল দিকেই

বুঝিতে হইবে। এইরূপ পন্থার স্ফুরণ হইলে স্বভাবের স্রোতে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়। এইজন্য সর্ব্বত্রই মার মুখ্য উপদেশ এই, যে যেখানেই থাকুক কোন একটা রাস্তা ধরিয়া চলিতে থাকুক— চলিতে চলিতেই সে এক সময়ে নিজের রাস্তা পাইয়া যাইবে।

১২। সম্প্রদায় রহস্য –

সম্প্রদায় মানে সম্যক্ প্রদান অর্থাৎ যেখানে ভগবান্ নিজেকে নিজের মধ্যে প্রদান করিতেছেন। অর্থাৎ যিনি দিতেছেন এবং যিনি নিতেছেন মূলে কিন্তু উভয়েই এক। অথচ দাতার দিক্ হইতে অভেদ এবং গ্রহীতার দিক্ হইতে ভেদ, উভয়ই যুগপৎ সত্য বলিয়া এই সম্প্রদান-ব্যাপারে ভেদ ও অভেদ উভয় সম্বন্ধই থাকিয়া যায়। কারণ উভয়ই তো সত্য। আবার এমন একটা দিক্ও আছে সেখানে ভেদাভেদের কোন প্রশ্নই নাই। তাই মা বলিয়াছেন, "সেখানে কোন রূপ, গুণ, ভাব, অভাব, কোন প্রশ্নই দাঁড়ায় না।"

১৩। অনন্ত স্থিতি—মূল এক—

মানুষের বুদ্ধি ও সংস্কার ভেদে দৃষ্টি যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয় তেমনি সাধন-পথের স্থিতিও ভিন্ন হয়। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রভৃতি দার্শনিক বাদ নানা প্রকার আছে। ঠিক সেই প্রকার সৃষ্টি প্রকরণেও আরম্ভবাদ, পরিণাম-বাদ, বিবর্ত্তবাদ, আভাস বাদ প্রভৃতি নানা প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি রহিয়াছে। মূলে শূন্য অথবা মূলে পূর্ণ উভয় প্রকার দৃষ্টিই প্রাচীন সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে কোনটিকেই মিথ্যা বলা চলে না এবং কোনটিকেই একমাত্র সত্যও বলা সম্ভবপর হয় না। যে ভূমিতে এক একটি বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় তাহা সর্ব্বপ্রকার আবরণ শূন্য ভূমি নহে, কারণ দৃষ্টিতে আবরণ থাকে বলিয়াই সকলে সকল জিনিষ দেখিতে পায় না এবং সকল দৃশ্য সকলের নিকট রুচিকরও হয় না। আবরণের পর্দ্দা সম্পূর্ণ ভাবে সরিয়া গেলে গণ্ডীবদ্ধ দর্শন থাকে না। তখন আবরণ-মুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে সত্যের অনন্তরূপ খুলিয়া যায়। যে আলোকে এই মহাসত্যের দ্বার উদ্ঘাটন হয় উহাই সেই অখণ্ড প্রকাশের আলোক। তখন দেখা যায় "তিনি স্বয়ং সর্ব্বরূপে অরূপে নানা ভাবে প্রকাশিত।" যদিও প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ লক্ষ্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই লক্ষ্য পরস্পর ভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়, তথাপি ইহা সত্য যে এই লক্ষ্যে উপনীত হইলে পরের অখণ্ড অবস্থাটা আপনিই খুলিয়া যায়। তাহার জন্য আর পৃথক্ উদ্যমের প্রয়োজন থাকে না। যতক্ষণ বিরোধ আছে ততক্ষণ বুঝিতে হইবে উহা স্থিতির ভূমি নহে। মহাপ্রকাশে বিরোধ কাটিয়া গেলে তখনই প্রকৃত স্থিতির সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ বিরোধহীন স্থিতিই স্থিতি—উহাই নির্ব্বিরোধ পূর্ণাঙ্গীণ প্রকাশ। বিরোধ অপূর্ণতার লক্ষণ, পূর্ণতার অভিব্যক্তি হইলে বিরোধ থাকিবে কেন? রাস্তায় চলার সময় ইষ্টনিষ্ঠা আবশ্যক, কিন্তু রাস্তার পর্য্যবসানে সর্ব্বত্রই নিজ ইষ্টের স্ফুরণ হয় এবং নিজের ইষ্টের মধ্যে সর্ব্ব সত্তার দর্শন হয়। তাই তখন বিরোধ থাকিতে পারে না।

---

# শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা*

( ১ )

বর্ত্তমান গ্রন্থে ভারতীয় এবং অভারতীয় কতিপয় লেখকের প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা প্রত্যেকেই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সম্বন্ধে যে অভিমত পোষণ করেন এবং মায়ের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব ইঁহাদের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ইঁহারা এই সকল প্রবন্ধে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই নিজকে মায়ের সশ্রদ্ধ অনুরাগী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মায়ের সঙ্গে ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পরিচয় অতি অল্প দিনের হইলেও কেহ কেহ দীর্ঘকাল যাবৎ মায়ের সঙ্গে অল্পাধিক ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। সেইজন্য ইঁহাদের রচনা স্বভাবতঃই মনোজ্ঞ, কেন না এগুলিতে তাঁহাদের মতামত সরল ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ আবার তাঁহাদের রচনার মধ্যে প্রাণের উচ্ছ্বাসও অকপটে ঢালিয়া দিয়াছেন। যদিও ইঁহারা সকলেই মায়ের বিশুদ্ধতা, জ্ঞান, প্রেম এবং অন্যান্য অসামান্য গুণগ্রাম দ্বারা প্রভাবান্বিত তথাপি ইঁহাদের মধ্যে কেহই মায়ের রহস্যময় স্বরূপ, জীবন এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ দুই একটি কথা ভিন্ন বিশেষ কিছু বলিতে পারেন নাই।

অবশ্য এইরূপই হওয়ার কথা। কারণ সন্তানের পক্ষে মাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতে যাওয়া মোটেই সমীচীন নহে। তাহা ছাড়া, যাহারা নিজেরাই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া আলোর জন্য চীৎকার করিতেছে তাহাদের পক্ষে মায়ের তত্ত্বে জ্ঞানের আলোক প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সকলের বোধগম্য করিয়া তোলা কি কখনও সম্ভবপর? এরূপ উদ্যম যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য তাহা বলাই বাহুল্য।

( ২ )

মায়ের সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া উহা এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকাকারে সম্বদ্ধ করিয়া দিতে আমি আমার বন্ধুগণ দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমি স্বীকার করিতেছি যে ঐ অনুরোধ রক্ষা করা সম্বন্ধে খুব সহজেই স্থির নিশ্চয় করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁহাদের বিরামহীন অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমার দ্বিধা দূর হয় নাই। অবশেষে আমি খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদের অনুরোধ মানিয়া নিয়া কিছু লিখিতে সম্মত হইয়াছি। কিন্তু লিখিব কি? এ বিষয়ে শুধু নিজের অযোগ্যতাই আমার দৃষ্টিপথে ভাসিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবীর লিখিত মায়ের জীবনীর (১৯৩৮ সনে প্রকাশিত) ভূমিকা লিখিতে গিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে ভাষার সাহায্যে মায়ের স্বরূপ-চিত্র যথাবৎ অঙ্কিত করা,—তিনি বস্তুতঃ কি তাহা এবং অন্ততঃ আমার নিকট কি ভাবে প্রতিভাত হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করা—আমার সাধ্যাতীত।

---

* 'Mother as seen by Her Devotees' নামক পুস্তকের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকার বঙ্গানুবাদ।

এখনও আমি পূর্ব্ববৎ সেই দুঃসাধ্যতা এবং দ্বিধা অনুভব করিতেছি। কেবল তাহাই নহে, ইদানীং মায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিবিড়ভাবে তাঁহার ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার রহস্যময় জীবন আমার নিকট আরও রহস্যপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সেইজন্য পূর্ব্বে মায়ের সম্বন্ধে কিছু লিখিতে যতটা সঙ্কোচ এবং সংশয় বোধ করিতাম এখন পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বোধ করিতেছি।

( ৩ )

এই সকল কারণে যাহাদের নিকট মা একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিয়া প্রতিভাত হন তাহাদের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। যে সকল সাধারণ, এমন কি অসাধারণ, ব্যক্তির সহিত আমরা পরিচিত তাঁহাদের চেয়ে মা এতই স্বতন্ত্র যে মার সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সুকঠিন। পুরাকালেও কোন কোন মহান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে এই প্রকার সমস্যা দেখা গিয়াছে যাহার ফলে তাঁহাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনুভব করিয়াছেন যে, যে সমাজের মধ্যে তাঁহারা বাস করিতেন এবং যাহাদের সেবায় তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহারাও তাঁহাদিগকে ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিতেছে না, এমন কি তাঁহাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণাও পোষণ করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অভিযোগ করিয়াছেন যে অনেকেই—এমন কি কোন কোন দেবতাও—তাঁহার পরম ভাব জানিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে গৌতম বুদ্ধও এই জাতীয় কথা বলিয়াছেন,—তিনি বলিয়াছেন যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই তাঁহাকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছে।

মায়ের জীবনে, এমন কি তাঁহার শৈশবাবস্থায়ও, যে অপ্রাকৃত ঘটনার প্রাচুর্য্য থাকিবে ইহা মোটেই বিস্ময়কর নহে। সাধু-সন্ত এবং যোগীদের জীবনে আমরা এ জাতীয় ঘটনা দেখিতে অভ্যস্ত। তাঁহাদের জীবনে এগুলির যথাযোগ্য স্থান আছে এবং গরিমাও আছে। কিন্তু ঐগুলি মায়ের মাধুর্য্যময় ও লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের সহিত অনুস্যূত অপূর্ব্ব সমতা ও আনন্দময় স্বভাবের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে মায়ের ব্যক্তিত্ব প্রবল হইলেও উহা তাঁহার ব্যক্তিত্বহীন অব্যক্ত পরম স্বরূপের সহিত অভেদ-ভাবাপন্ন, এমন কি এক বস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইহা সুবিদিত যে সাধু-সন্তদের জীবনে জ্ঞানোদয় ও মুক্তি লাভের পূর্ব্বে প্রথমে একটা অজ্ঞান ও বন্ধনের দশা এবং উত্তরকালে একটা আস্পৃহা, উদ্যম ও কঠোর তপস্যার অবস্থা সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হয়। ইহা অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের বর্ত্তমান জন্মেরই প্রাক্তন অবস্থা, কিন্তু কোন কোন অসাধারণ ক্ষেত্রে ইহা পূর্ব্বজন্মের ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মায়ের বেলায় আমরা শুনিতে পাই যে ঐ অজ্ঞান অবস্থা তাঁহার কোন কালেই ছিল না। মায়ের জীবন যে প্রাকৃতিক কার্য্যকারণাদি নিয়মের অধীন নয় এবং তাঁহার দেহধারণ যে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য নয় ইহা মা স্পষ্টভাবে বলিয়া থাকেন। ঐ উক্তি হইতে মায়ের পূর্ব্ব জন্মের সম্ভাব্যতাও বারিত হইয়া যায়। ইহাও আমরা দেখিতে পাই যে বিবাহের পূর্ব্বে এবং উহার

অব্যবহিত পরে মায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণের অনুরূপ মার্গ-পরিগ্রহ এবং তদনন্তর তাঁহার মধ্যে ভগবৎ-সাধনার বিভিন্ন ধারার প্রকাশ বস্তুতঃ ক্রীড়াচ্ছলে স্বেচ্ছা-স্বীকৃত সংযমের অভিনয় ভিন্ন অন্য কিছু নহে। উহা দ্বারা মায়ের পরবর্ত্তী জীবন বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হয় নাই।

জগতের প্রসিদ্ধ সন্তদের মধ্যে আমরা প্রায় এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না যাঁহার মধ্যে দিব্য-জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে মানসিক অশান্তি এবং নৈরাশ্য লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মায়ের জীবনে ঐ জাতীয় আত্মিক বা মানসিক অন্ধকার এবং জ্ঞানাবতরণের অনুভূতি সমস্তই লীলারূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। মায়ের সম্বন্ধে এ কথাও বলা যায় যে তিনি অনাদি কাল হইতে কি আছেন এবং অনন্ত কাল কি থাকিবেন সে বিষয়ে সর্ব্বদাই সজাগ। মুহূর্ত্তের জন্যও ঐ স্বরূপ-জ্ঞানের বিচ্যুতি তাঁহার ঘটে নাই।

আমরা এ বিষয়েও একরূপ নিশ্চিন্ত যে মায়ের আত্মজ্ঞান বলিয়া মানিলে উহা তাঁহার নিজ সত্তাতিরিক্ত অন্য কোন আগন্তুক কারণের সহকারিতা হইতে উদ্ভূত বলা চলে না। বস্তুতঃ উহা তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম বলিয়া স্বাভাবিক ও পূর্ণ এবং তাঁহার মধ্যে নিত্য বিদ্যমান। উহাকে 'পূর্ণতর' করিবার জন্য ভিতর হইতে কোন পুরুষকার বা উপর হইতে কোন কৃপার আবশ্যকতা প্রতীত হয় নাই।

( ৪ )

সাধারণতঃ জ্ঞান প্রকাশের তিনটি ধারা স্বীকৃত হইয়া থাকে, যথা—(ক) দৈব, (খ) আর্ষ এবং পৌরুষ।

প্রথমটিতে জ্ঞানের প্রকাশ হয় কোন দিব্য-মূর্ত্তির গভীর ধ্যান হইতে, যেমন অর্জ্জুনের জ্ঞান হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ হইতে। ঐ ধ্যানের সঙ্গে ধ্যেয় হইতে শক্তিপাতের অনুভূতি থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। আবার শক্তিপাত স্থলে ঐ শক্তি স্পর্শ, বাক্, দৃষ্টি, অথবা শুধু ভাবনা দ্বারা সঞ্চারিত হইলে উহা তদনুসারে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম রূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য হয়। শক্তির তীব্রতার তারতম্য ছাড়া উহার মধ্যে গুণেরও তারতম্য থাকিতে পারে, যাহার ফলে জ্ঞানোদয়ের মূল উৎস বা সাধ্যের সহিত সাধক আত্মার অভিন্নতা পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইতে পারে। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে যেখানে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে তৎসহ ভাবী বা পূর্ব্বভাবী রূপে শক্তিপাতের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে ভৃগু বরুণ হইতে আত্মার পঞ্চকোষ বিশ্লেষণের যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, অথবা নচিকেতা যম হইতে যে বিশেষ বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন উহা ঐ জাতীয়ই।

আর্ষজ্ঞানকে প্রাতিভজ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান ব্যক্তি-বিশেষের মৌখিক উপদেশ হইতে উদিত হয় না। ইহা ভিতর হইতে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হইল ত্রিশঙ্কু, যিনি নিরন্তর নিজকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবনা করিয়া উপাসনা-মার্গে যথাসময়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় যে জ্ঞান মানব-গুরু দ্বারা মানব-শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে তাহাই পৌরুষ জ্ঞান; যেমন শুকদেব হইতে পরীক্ষিতের জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। এ জাতীয় জ্ঞান প্রাক্তন সুকৃতির পরিপক্কতা হেতু একান্ত অনুগত ভক্তের মধ্যে উদিত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও ঐ জ্ঞানের সহিত মানব-

গুরু হইতে সাক্ষাৎভাবে শক্তিপাতের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। তবে শক্তিপাত হউক বা না হউক উভয় ক্ষেত্রেই বিকল্প রূপে উপাসনার সদ্‌ভাব বা অভাব ও সঞ্চারিত। অন্যান্য প্রকার জ্ঞানের ন্যায় এই জ্ঞানেও মনোগত ও গুণগত শ্রেণী-বিভাগ সম্ভব।

মায়ের সম্বন্ধে প্রথম এবং তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান আমরা বাতিল করিয়া দিতে পারি, কারণ উভয় স্থলেই নিজের স্বরূপাতিরিক্ত পৃথক্ কেন্দ্র হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ঐ কেন্দ্র দিব্যই হউক অথবা মানবীয়ই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। উহার একটি হইল ভগবৎ বিষয়ে ধ্যান ধারণা এবং অন্যটি হইল গুরু-ভক্তি। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞানও আপাততঃ মায়ের বেলায় গ্রহণযোগ্য নহে, কেন না দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় যে ঐ জ্ঞানের আধার দুরূহ সাধন পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শেষে ঐ স্থিতি হইতে পতিত হইয়াছেন। ঐ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানই নয়। যথার্থ প্রতিভা কি সে বিষয় পরে আলোচনা করিব।

( ৫ )

এখন প্রশ্ন হইতেছে, মায়ের সহজাত আত্মজ্ঞানের স্বরূপ কি? পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে যদিও লৌকিক জ্ঞানের ন্যায় আত্মজ্ঞানের মূল আমাদের ভিতরেই থাকে তথাপি উহার উদ্দীপক কারণ থাকে বাহিরে, যে-হেতু উহা বাহ্য শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু কখনও কখনও এরূপও হইতে পারে যে জ্ঞানের অভ্যুদয় ভিতরের শক্তির ক্রিয়াবশতঃই হয়,—সে ক্ষেত্রে বহিঃশক্তিগুলি ঐ সমুদিত জ্ঞানের বিস্তারের সহায়ক হয় মাত্র। ইতিহাসে জ্ঞানোদয়ের এই দুইটি প্রণালীরই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবৎ-কৃপা যে শুধু লোকের ধার্ম্মিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক এমত নহে, কিন্তু ঐ চেতনাকে পরিপুষ্ট করিয়া ভগবৎ-সত্তার সহিত একীকরণেও উহার সবিশেষ কার্য্যকারিতা আছে। সুতরাং সক্রিয় আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের পক্ষে ভগবৎ-কৃপা যে মূল কারণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে সাধারণতঃ এমন একটি নিমিত্ত অথবা আধারের ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঐ কৃপা অভিব্যক্ত ও অধিকারী জীবের অধিগম্য হইতে পারে। কারণ সাধারণ মনুষ্যের দৈহিক এবং মানসিক সংস্থান এরূপ নহে যে উহা সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবৎ-শক্তির সঞ্চারকালীন তীব্র বেগ ধারণ করিতে পারে। সচরাচর জড়-সংস্পর্শহীন শুদ্ধ আধারে, অর্থাৎ মায়িক সৃষ্টি-আরম্ভের পূর্ব্বকালীন দেহেন্দ্রিয়াদি-বর্জ্জিত যোগ্য আত্মাতেই, সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবৎ-কৃপার প্রকাশ হয়। কিন্তু ঐ আত্মা সৃষ্টির ধারাতে নামিয়া আসিয়া অশুদ্ধ মায়িক দেহ ধারণ করিলে আর তাহার নিরাধার সাক্ষাৎ ভগবৎ-কৃপা গ্রহণের সামর্থ্য থাকে না। তখন সাধারণতঃ তাহাকে অন্তরালবর্ত্তী কোন আধারের মধ্য দিয়া উহা গ্রহণ করিতে হয়। ঐ আধার অমায়িক বিশুদ্ধ দেহ অথবা মায়িক ও অমায়িক উভয় উপাদানের যোগবশতঃ মিশ্রদেহ ভিন্ন অপর কিছু নহে। সৃষ্টির আদিতে যাঁহাদের উপর বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ এবং দিব্যজ্ঞান প্রদানের ভার ন্যস্ত থাকে সেই সব বিশুদ্ধ দেহধারী জগদ্‌গুরুরূপী আত্মাদের সঙ্ঘের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই প্রসঙ্গে দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ এবং মানবৌঘ নামে গুরু-সম্প্রদায়ের যে তিনটি বিশিষ্ট

শ্রেণী-বিভাগ আছে তাহাদের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে যে দৈব এবং পৌরুষ নামক গুরুপংক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি দিব্যৌঘ এবং মানবৌঘের সহিত উহাদের অতি ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে। এই জ্ঞানদাতা দিব্য এবং মানব শ্রেণীর অন্তরালে আগম মতে সিদ্ধ বা অতি-মানব গুরুদের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল দেহই অদীক্ষিত জ্ঞান-পিপাসুদের নিকট আচার্য্য বা গুরুদেহরূপ আধারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যে সকল আত্মা মায়িক-দেহ-সম্বন্ধহীন ও কৈবল্যাশ্রিত তাঁহাদের উপরই ভগবৎ-কৃপা অব্যবহিতরূপে ও মুক্ত ভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহা সেইখানেই সম্ভব যেখানে কৃপা প্রকাশের জন্য কোন বহিরবলম্বনের প্রয়োজন হয় না এবং তাহার সম্ভাবনাও থাকে না (প্রলয়াবস্থাতে)। ইহাই নিরধিকরণ অনুগ্রহ; এবং ঐ কৃপা যখন অমায়িক বিশুদ্ধ দেহের ভিতর দিয়া সৃষ্টির প্রাক্‌কালে মায়িক দেহে গৌণ ভাবে কার্য্য করে তখন ইহাকে সাধিকরণ অনুগ্রহ বলা হয়; কেন না তখন ইহা আধার অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করে। অবশ্য কৃপা বলিতে এখানে ভগবানের বিশেষ কৃপাই বুঝিতে হইবে। যে কৃপা পূর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য ফল প্রসব করে তাহা সাধারণ কৃপা। উহা এই আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভগবৎ-কৃপা সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে, যদিও উহা প্রকৃত পক্ষে একটি মতেরই দুইটি দিক্ মাত্র। উভয় মতানুসারেই গুরু হইতেছেন ভগবানের কৃপা-শক্তির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান। তবে এক মতে বলা হয় যে এই শক্তি নিরপেক্ষভাবে স্বয়ং ক্রিয়াশীল, অন্য মতে ইহা আধার স্বরূপ কোন যোগ্য মূর্ত্তির ভিতর দিয়া সক্রিয় হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, কারণ ব্যবহার ভূমিতে উভয় মতানুসারেই যিনি গুরুরূপে ভক্তির বিষয় তিনি বাস্তবিক পক্ষে বিশ্বাতীত। তবে এ সম্বন্ধে একটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক। সৃষ্টির উন্মেষকালে কালাতীত বিশুদ্ধ সত্তার আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন দিক্‌গুলির মধ্যে স্বরূপগত বৈচিত্র্য থাকিলেও কালগত পূর্ব্বাপর-ভাব-রূপ ক্রম থাকে না, কিন্তু উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই নানা প্রকার জটিলতা থাকে। কিন্তু সৃষ্টির অতীত নিত্য স্ব-প্রকাশ ও সমরস অদ্বয় সত্তাতে কোন প্রকার জটিলতার অবকাশ নাই। কারণ উহা তত্ত্বাদি যাবতীয় বিভাগ হইতে মুক্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে সেই ভাবের দৃষ্টিতে গুরু তত্ত্বটি অখণ্ড নিত্য সত্তার একটা দিক্‌মাত্র। এই অখণ্ড সত্তা সর্ব্বব্যাপক এবং সকলের সহিত অভিন্ন। বিভুত্ব হেতু ইহা যুগপৎ সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান থাকায় সকলের সহিত অভিন্ন হইলেও ইহার সর্ব্বাতীতত্বরূপ বৈলক্ষণ্য কখনই ক্ষুণ্ণ হয় না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তিবিশেষ কদাচিৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে গুরুপদারূঢ় হইয়া ঐ পদের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন সত্য, কিন্তু উহা সাময়িক মাত্র। উক্ত পদারূঢ় ব্যক্তির সুকৃতি নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্তই উহার স্থায়িত্ব। উহা নিঃশেষ হইলেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তখন ঐ জাতীয় অন্য একজন আবার ঐ পদে আরূঢ় হইয়া উহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন ও ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে গুরু-ভাব একাধারে মানবীয় ও দিব্য উভয়ই—ভগবৎ-শক্তি নিজ প্রয়োজনে যখন শুদ্ধ বাসনাময় প্রগতিশীল কোন আধার আশ্রয় করিয়া

প্রকাশিত হন তখন উক্ত আধারকে লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে মানবীয় বলা হয়, আবার যখন ঐ শক্তির স্বতঃসিদ্ধ মহাকরুণাময় সত্তার দিকে লক্ষ্য পড়ে—যাহা চিরন্তন এবং যাহা আশ্রিত আধারকে অনুপ্রাণিত করিয়া স্বকার্য্য সাধন করে—তখন উহা দিব্য। ভগবৎ-শক্তি মনুষ্য অথবা যে কোন দেহধারীর ভিতর দিয়াই কার্য্যকরী হইতে পারে। সেইজন্য এরূপ বিধান আছে যে, যিনি গুরু তিনি মানব হউন বা অতিমানব হউন অথবা দিব্য হউন, শিষ্য তাঁহাকে ভগবানের মতই জ্ঞান করিবে। বাস্তবিক পক্ষে ভগবৎ-সত্তা খণ্ড সত্তার গুণাদি হইতে নির্মুক্ত—মনুষ্যোচিত কোন ক্রিয়া-কলাপই তাঁহার উপর আরোপ করা যায় না।

যাহাদের মধ্যে পরম অনুভূতি স্বতঃ উদিত হয় না তাহাদিগকে অবশ্য উহার জন্য প্রজ্ঞা-সম্পন্ন কোন মহাপুরুষের ( গুরুর ) অথবা ঐশ্বরিক প্রকাশের (শাস্ত্রের) উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে ইহা স্বতঃস্ফুরিত হইয়া অপরোক্ষ এবং অখণ্ড জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয় তাঁহাদের বেলায় আর বহিরবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত স্তরই তাঁহাদের অধিগত এবং তাঁহারা উহা জ্ঞানলিপ্সু অপরকে প্রদান করিবার সামর্থ্যও রাখেন। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে যাহাকে আত্মদীক্ষা বা আত্মসংস্কার বলা হয় উহা ইন্দ্রিয়বর্গের এমন একটি অন্তর্মুখী অবস্থা যাহার ফলে ইন্দ্রিয়-শক্তি আত্ম-স্বরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া সুপ্ত চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। স্বোপার্জ্জিত শক্তি-সম্পদের ইহাই রহস্য। এই সকল লোক অন্তর্যামীর তত্ত্ব বুঝিতে কোন বাহ্য গুরুর কাছে যাইবার প্রেরণা বোধ করেন না, কারণ উহা তাঁহাদের নিজের ভিতর হইতে স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। বিকল্প-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞান কি ভাবে প্রকাশিত হয় ইহা তাহারই একটি উদাহরণ। এই জ্ঞান আবার অপরকে প্রদান করিবার সময় আধারের যোগ্যতা এবং অন্যান্য সদ্‌গুণের বিচার আবশ্যক হয়। শিষ্যের আধার যদি একেবারে নির্ম্মল হয় তবে তাহার আত্মজ্ঞান-প্রকাশের পক্ষে গুরুর শুভ সংকল্পই যথেষ্ট। কিন্তু তাহা যদি না হয় তবে তাহার যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুসারে আনুষঙ্গিক কিছু বাহ্য আচার বা কর্ম্মাদিরও প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ অদ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেই নিজের গুরু। ইহাকে 'অকল্পিত গুরু' বলা হয়,—ইনি স্বতঃস্ফুরিত পূর্ণজ্ঞান-এবং শক্তির আধার। কিন্তু এই স্বয়ং-লব্ধ জ্ঞান বা শক্তিতে যদি অপূর্ণতা থাকে তবে ইহাকে ভাবনা, জপ, অথবা যোগ, যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া পূর্ণ করিতে হয়, অর্থাৎ নিরন্তর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ভাবনা দ্বারা, অথবা কোন শক্তিযুক্ত মন্ত্রের জপের দ্বারা অথবা ঐ জাতীয় অন্য কিছু উপায় দ্বারা তাহার স্বয়ং-লব্ধ জ্ঞানের ন্যূনতা পূরণ করিয়া লইতে হয়। এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে 'কল্পিত-কল্পক' বলা হয়। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে পূর্ব্বোক্ত শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানে মন, প্রাণ বা দেহ কিছুরই সহযোগিতা আবশ্যক হয় না, কিন্তু শেষোক্ত জ্ঞানে ঐ সহযোগিতা অপরিহার্য্য বিবেচিত হয়।

এই যে দুই প্রকার জ্ঞানের কথা পূর্ব্বে বলা হইল ইহার যে কোনটির সহিত আপাত দৃষ্টিতে মায়ের আত্মজ্ঞানের সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। মায়ের জীবনে যে সাধন-ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে উহাকে যদি প্রকৃত সাধনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, যাহার উদ্দেশ্য স্বয়ং-লব্ধ অপূর্ণ জ্ঞানের

পূর্ণতা সম্পাদন, তাহা হইলে মায়ের স্থান হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, অর্থাৎ 'কল্পিতকল্পক' শ্রেণীতে। কিন্তু মায়ের ঐ সকল ক্রিয়া-কলাপকে যদি প্রকৃত সাধনা না বলিয়া শুধু আত্মজ্ঞানের বহিঃস্ফুরণ রূপে ধরিয়া লওয়া যায় তবে মায়ের স্থান হইবে প্রথম শ্রেণীতে অর্থাৎ অকল্পিত শ্রেণীতে।

কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে মায়ের ব্যাপারটি একেবারেই স্বতন্ত্র। ইহাকে উক্ত দুই শ্রেণীর কোন শ্রেণীতেই ফেলা যায় না। মা কোন গুরু হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই, মাত্র ইহাই মায়ের স্বরূপ-রহস্য উদ্‌ঘাটনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈদিক যুগেও ত্রিশঙ্কু নামক এক ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানের স্বতঃস্ফুরণ দেখা গিয়াছে, যিনি নিরন্তর 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই ভাবনা দ্বারা ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালেও জার্ম্মনীর 'ভগবদুপদিষ্ট দার্শনিক' জ্যাকব বিহ্‌মের ( খৃঃ ১৫৭৫ —১৬২৪ ) কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যিনি নিজের ভিতর হইতে অথবা কোন ঊর্দ্ধস্থ সত্তা হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা মধ্যবর্ত্তী কোন নিমিত্ত ব্যতিরেকেও অক্রমভাবে অথবা ক্রমোন্নতির পথে জ্ঞানপ্রকাশের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রে ঐ জ্ঞানে জাতি, গুণ এবং মাত্রা হিসাবে তারতম্য থাকে। অকল্পিত যোগীদের স্বতঃস্ফুর্‌রিত জ্ঞানও এই পর্য্যায়-ভুক্ত। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে এ সমস্তই তীব্র শক্তিপাতের ফলে হইয়া থাকে। অধ্যাত্ম শাস্ত্রের, বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের, সুষ্ঠু আলোচনা হইতে ইহা প্রতীত হয় যে শক্তিপাত তীব্র, মধ্য এবং মন্দ ভেদে স্থূলতঃ তিন প্রকার। ইহার প্রত্যেকটি আবার অবান্তর ভেদে তিন প্রকার। সুতরাং মোটের উপর শক্তিপাত নয় প্রকার। প্রথমটি হইল তীব্রতম এবং নবমটি হইল মন্দতম। এই বিভাগ অনুসারে দ্বিতীয় প্রকার বা তীব্র-মধ্য শক্তিপাতের ফলে শক্তিধারকের আত্মজ্ঞান লাভ হয় এবং ইহার জন্য পৃথক্ গুরুর প্রয়োজন হয় না। ইহা পতন মাত্রই জীবাত্মাকে সংশোধিত করিয়া উহার রূপান্তর সাধন করে। যাহাকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় অনুপায় অথবা শাম্ভবোপায় বলা হয় তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে যাহাকে উপায় বলা হইল উহা পরাশক্তি, অথবা পরাশক্তির সৃষ্টি-কালীন প্রথম উন্মেষাত্মক ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। অবশ্য ইহা জ্ঞান এবং ক্রিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তথাপি ইহা উপায় মাত্র, উপেয় নহে। ইহার উদ্দেশ্য হইল জীবত্ব বা পশুত্বকে শিবত্বে পরিণত করা। জীবাত্মার উদ্ধার সাধন করিয়া উহাকে উহার স্বাভাবিক দিব্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই হইল ইহার একমাত্র লক্ষ্য।

পূর্ব্ব-বর্ণিত দৃষ্টান্তের সহিত সাদৃশ্য-মূলক ভাবে মায়ের আত্মজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা যে সহজ নয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাধু-সন্তদের অনুভূতিও ইহার উপর কোন আলোকপাত করিতে পারে না। সেইজন্য মায়ের স্বরূপ ও ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব নিরূপণ করা এত দুঃসাধ্য। মা যে কখনও অজ্ঞানে আবৃত ছিলেন না ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং সেইজন্য মায়ের বেলায় শক্তিপাতের, এমন কি তীব্রতম শক্তিপাতের, প্রশ্নও উত্থিত হইতে পারে না। তিনি যে বালিকা বয়সেই সাধিকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সত্য এবং এই সময়ে প্রকৃত সাধিকার যে যে অবস্থার অনুভব হওয়ার কথা সে সবই ক্রমশঃ মায়ের মধ্যে হইয়াছিল তাহাও সত্য। কিন্তু ইহা ছিল

অভিনয়। এই অভিনয়ে তিনি প্রথমে অজ্ঞানী সাজিয়া নানা প্রকার কঠোর তপস্যা, মৌন ধারণ, আহার সংযম, জপ সাধন, যৌগিক ক্রিয়ার অভ্যাস ও পূজাদি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অভিনয়েরই অংশরূপে আত্মজ্ঞানের বিকাশও হইয়াছিল। বিরহ যাতনা, প্রাণের নীরসতা, শেষে মিলনের আনন্দ—এ সমস্তই তাঁহার স্বয়ং-অভিনীত সাধন-নাট্যের যথাস্থানে ছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই সাধনার অনুকরণে কল্পিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটি অংশ এমন ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছিল যাহাতে উহার স্বাভাবিকতা বেশ ফুটিয়া উঠিতে পারিয়াছিল। কিন্তু মায়ের এই স্বেচ্ছা-স্বীকৃত অজ্ঞান এবং পরম জ্ঞানাভিলিপ্সাময় সাধারণ সাধিকার অনুকরণের পশ্চাতে ছিল তাঁহার নিত্যসিদ্ধ, সুরক্ষিত, অচল, অটল, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান। কেহ যেন ইহাকে দ্বিধা-বিভক্ত আত্মার ক্রিয়াকলাপ বলিয়া মনে না করেন,—ইহা হইল সদাজাগ্রত আত্মচেতনা-সম্পন্ন ইচ্ছাশক্তির একটা প্রকাশ, যাহা রঙ্গমঞ্চে এক সময়েই দুইটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে—একটি হইল আলো ও আঁধারের মধ্য দিয়া প্রগতিশীল সংযত-জীবন সাধিকার ভূমিকা আর দ্বিতীয়টি হইল অচঞ্চল সাক্ষীর ভূমিকা, যে ভূমিকায় উহা অভিনেত্রীর পশ্চাতে অলক্ষিত থাকিয়া শান্তভাবে সমস্ত লক্ষ্য করিতেছে এবং রঙ্গমঞ্চে নিজকৃত অভিনয়ের নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।*

কেহ কেহ মাকে কোন দেব বা দেবীর অবতার বলিয়া মনে করেন। এই মতের যে মূল্যই থাকুক না কেন ইহা পূর্ব্বোক্ত মতের জটিলতা হইতে মুক্ত। কিন্তু 'অবতার' বলিতে আমরা কি বুঝি? গ্লানিপূর্ণ জগতে শান্তি আনয়ন, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের সংস্থাপন এবং মানব সমাজে নৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা, এই সকল কার্য্যের জন্য কারণ-জগৎ হইতে স্থূল জগতে যে শক্তির অবতরণ হয় তাহাকেই আমরা অবতার বলিয়া থাকি। অবতার এবং সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অবতারে যে শক্তি নামিয়া আসে উহার সহিত মূলের যোগ-সূত্র অচ্ছিন্ন থাকে, আর মনুষ্যের বেলায় ঐ যোগ-সূত্র ছিন্নবৎ হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে মূলের সহিত এই অবতীর্ণ শক্তির সম্বন্ধ হইল অংশীর সহিত অংশের সম্বন্ধের ন্যায়। আর যদি অংশাংশী না বলিয়া ইহাকে অভিন্নও মনে করা যায় তাহা হইলেও অবতীর্ণ শক্তি মূলশক্তির সম্প্রসারণ ভিন্ন আর কিছু নহে। মূলকেন্দ্র অজ্ঞান-শক্তির কার্য্য-ক্ষেত্রের বাহিরেই থাকিয়া যায়। অবতার বলিতে অবতরণ বুঝায় এবং এই অবতরণ যে কোন উর্দ্ধতর কেন্দ্র হইতে হইতে পারে তাহা 'অবতার' শব্দ হইতেই প্রতীত হয়। পরব্যোমে বা মহাবৈকুণ্ঠে প্রত্যেক অবতারেরই নিজ নিজ কেন্দ্র বা আদর্শ-ভূত স্বরূপ আছে। বিশ্ব-পরিচালনার জন্য এইগুলিই হইল কৈন্দ্রিক শক্তির বিভিন্ন রূপ।

মাকে কোন্ বিশিষ্ট দেব বা দেবীর অবতাররূপে গ্রহণ করা হয় তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে, কেন না আমাদের যে সমস্যা উহা সকল মতেই অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে। এমন কি, ঐ সকল দেবদেবীকে যদি স্বরূপতঃ ভগবান্ হইতে অভিন্ন বলিয়াও ধরা যায় তাহা হইলেও আমাদের ঐ সমস্যার সমাধান হইবে না। মায়ের সঙ্গ করিয়া

* শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবী লিখিত মায়ের জীবনীর যে কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মায়ের এই সময়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

আমি তাঁহাকে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি এবং মা নিজেও তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকারান্তরে যাহা মাঝে মাঝে বলিয়া থাকেন তাহাতে মনে হয় না যে মাকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিলেই আমাদের সমস্ত সমস্যার নিরাকরণ হইবে। তবে বৌদ্ধদের ধর্ম্মকায়ের সহিত নির্ম্মাণকায়ের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ বুঝাইতে যদি 'অবতার' শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু তখনও কিছু কিছু সমস্যা থাকিয়াই যাইবে।

যদি নির্ম্মাণকায়কে ধর্ম্মকায়ের বাহ্য ও প্রকট রূপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও অবতারত্বের সমস্যা পূর্ব্ববৎই বিদ্যমান থাকিবে। তবে যদি বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম, সংভোগ ও নির্ম্মাণ এই সমস্ত কায়ার অভিন্নতা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে হয়ত সমস্যার কিছুটা নিরসন হয় সত্য, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমাদিগকে একটি আদি-বুদ্ধ কল্পনা করিয়া লইতে হয় যাহার সঙ্গে ঐতিহাসিক বুদ্ধের কোন সম্বন্ধ থাকে না। ঐতিহাসিক বুদ্ধের ক্ষেত্রে বহু-জন্মব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনার ইতিহাস আমরা পাই, যাহা দ্বারা তিনি মূল অবিদ্যার উচ্ছেদ এবং অন্যান্য সদ্‌গুণের উৎকর্ষ সাধন করিতে তৎপর ছিলেন এবং যাহার ফলে তিনি আদর্শ-জ্ঞান, সমতা-জ্ঞান, প্রত্যবেক্ষাজ্ঞান এবং কৃত্যানুষ্ঠান জ্ঞান—এই চতুর্বিধ জ্ঞান দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত জ্ঞান মার মধ্যে জন্মাবধি বিদ্যমান আছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান সকলের প্রথমটি হইল সর্ব্বকালের, সর্ব্ব বস্তুর অবাধিত জ্ঞান। ইহা কতকটা দর্পণ সদৃশ, যাহাতে সমস্ত বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হয়। দ্বিতীয়টি হইল সর্ব্বভূতের মূলতঃ সমতা ও একত্বের জ্ঞান। তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান হইল সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। চতুর্থ প্রকার জ্ঞানের সম্বন্ধ হইতেছে জগৎ এবং উহার উৎকর্ষ সাধনের সহিত। ঐ জ্ঞান মানব-জাতির সেবাতে উৎসর্গীকৃত। ইহা দ্বারা বিভিন্ন অভাবযুক্ত বিভিন্ন লোকের প্রার্থনার পরিপূরক অসংখ্য নির্ম্মাণকায়ের প্রকাশ সম্ভব হয়।

কেহ কেহ মাকে বিলাস, অর্থাৎ কালাতীত দিব্য সত্তার দেশ ও কালের মধ্যে আত্মসম্প্রসারণ, মনে করেন। এ মত কতখানি বিচারসহ তাহা আমি জানি না। যে অর্থে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণকে গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলিয়া ধরা হয়, উহাই যদি বিলাসের প্রকৃত মর্ম্ম হয় তাহা হইলে উহাতে মূল অপেক্ষা বিলাসের জ্ঞান এবং শক্তির ন্যূনতা স্বীকৃত হইয়াছে। এই অর্থে মাকে বিলাস বলিলে তিনি নিজের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত যে বর্ণনা দিয়াছেন উহার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা কষ্টকর হইয়া পড়ে—

"এ শরীরকে যেখান হইতে যে ধারার কথা জিজ্ঞাসা করিবে সেখানে সে ভাবেই। সেইজন্য এ শরীরের কি কথা আর কথা না। কোন ধারা থাকিলে ধরা আছে। ধরা থাকিলে অধরা। যেখানে ধরা অধরার প্রশ্ন নাই, সেই-ই। যেখান হইতে যা' বাজাইয়া লও, শোন। এ শরীরটার কাছে এ মত ঐ মতের প্রশ্ন নাই।"

এই বর্ণনা যে বিলাস সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না তাহার কারণ সুস্পষ্ট।

তবে কি মা স্বয়ং-রূপ ভগবানের পূর্ণপ্রকাশ? চরম-পরমের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব? মা কি তবে বিশ্বের এবং আমাদের সকলের অন্তরাত্মার বহিঃপ্রকাশ, যিনি স্বেচ্ছায় স্বরূপ আবৃত করিয়া আমাদিগকে

বদ্ধাবস্থার যন্ত্রণা ও হাহাকার হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার কাছে টানিয়া নিবার জন্য মনুষ্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন? ইহার উত্তর কে দিবে?

মার সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া যে সকল সমস্যা আমার মনে উঠিয়াছে উহার কিছুটা আমি পাঠকের সম্মুখে স্থাপিত করিলাম। এইগুলি বিচার করিয়া সকলে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে মা কোন বিশেষ কাজের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, যেমন লোকের দিব্য চেতনা উদ্বুদ্ধ করা, জগতে প্রেম ও শান্তি স্থাপন করা ইত্যাদি। কেহ কেহ আবার ইহা অস্বীকার করেন, কেন না মায়ের কর্ম্মগুলি উদ্দেশ্যশূন্য, অর্থাৎ মূলের ইচ্ছা দ্বারাই নিষ্পন্ন। সাধারণ মনুষ্যের মত তাঁহার নিজস্ব কোন ইচ্ছা নাই। তবে ইহা সুস্পষ্ট যে এমন একটি মহান্ প্রকাশ বা অবতরণ যথাসময়ে মহাফল প্রদান করিবে না তাহা মনে হয় না। মা নিজেকে গুরু বলিয়া প্রচার করেন না, যদিও কখন কখন তিনি কাহারও কাহারও নিকট পরোক্ষভাবে গুরুরূপে পরিগণিত হন। কারণ যিনি গুরু তাঁহার মধ্যে গুরু হইবার শুদ্ধ বাসনা থাকে। কিন্তু মা প্রথম হইতেই সমস্ত বাসনা হইতে মুক্ত। তিনি যা' তা'-ই, উহার কিছু কম বা বেশী নহেন। গুরু যে সত্য প্রদর্শন করেন এক অর্থে মা বোধ হয় স্বয়ংই সেই সত্য।

অনেক সময় বলা হয় যে মায়ের দেহ এবং মন নাই। এই কথাগুলির অর্থ স্পষ্ট নহে, অন্ততঃ আমাদের কাহারও কাহারও নিকট। আমি যে ভাবে উহা বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় ঐ উক্তির অর্থ হইল এই যে, জাগতিক অনুভূতির ধারক-বাহকরূপে আমরা যে নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃসম্পন্ন স্থূলদেহ দেখিতে পাই উহা পূর্ব্বজন্মের অজ্ঞান মূলক বিপক্ক ও ফলোন্মুখ কর্ম্মের ফল। মা এই জাতীয় কারণ-পরম্পরা হইতে বিমুক্ত বলিয়া আমাদের ন্যায় দেহ ও মনের বোঝা বহন করেন না। যিনি অজ্ঞানজ কর্ম্ম হইতে চিরমুক্ত তাঁহার উপর শুদ্ধ মন এবং শুদ্ধ দেহও আরোপ করা চলে না।*

ভারতীয় চিন্তাধারায় সমজাতীয় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কর্ম্মের সহিত দেহের সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে জৈন ধর্ম্মে বলা হইয়াছে যে ঘাতী কর্ম্ম নিবৃত্ত হইলেই জীবন্মুক্ত অবস্থার উদয় হয়। ঘাতী কর্ম্ম হইল সেই সকল কর্ম্ম যাহা দ্বারা মোহ, অন্তরায় এবং জ্ঞান ও দর্শনের আবরণ সংঘটিত হয়। কিন্তু অঘাতী কর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা লোকের দেহ

---

* এইজন্য প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ "সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে" শাক্যমুনির নরদেহকে 'অলীক' বলা হইয়াছে। গৌতমবুদ্ধের জীবন ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থের অভিমত অধ্যাপক পৌসী অতি নিপুণতার সহিত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"শাক্যমুনি পরিপূর্ণ ভাবে দিব্য হইলেও ভগবান্ নন। তিনি অনাদি কাল হইতেই বুদ্ধ। তিনি সমস্ত বিশ্ব, ভাবীবুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণের জনক। তিনি চিরন্তন বিধাতা, তিনিই জীবের উদ্ধার-সাধন এবং নির্ব্বাণ প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। সাধারণ লোক দেখে যে তিনি মায়িক মনুষ্য দেহ ধারণ করেন, জন্মগ্রহণ করেন, জ্ঞানদান করেন অর্থাৎ ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন করেন ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আভাসরূপে অলীক শাক্যমুনিগণ জগতে আবির্ভূত হইতে থাকিলেও প্রকৃত শাক্যমুনি গৃধ্রকূট পর্ব্বতে ভাবীবুদ্ধদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের সিদ্ধান্তানুসারে এই খাঁটি শাক্যমুনি নিত্য এবং দিব্য হইলেও ভগবান্ নন।

(নাম), দেহের অবস্থা (গোত্র), আয়ু ও সুখ দুঃখাদি ভোগের উদয় হয়, উহা চলিতেই থাকে।* এমন কি, তীর্থঙ্করও এই অঘাতী কর্ম্ম হইতে মুক্ত নহেন। যখন এগুলিরও ধ্বংস হয় তখনই কর্ম্মের পূর্ণ সমাপ্তি হয় এবং তখনই দেহপাত হয়। ইহাই হইল আত্মার বিদেহ অবস্থা। ঘাতীকর্ম্মের অবসান ও কেবল জ্ঞানের উদয় এক প্রকার সমকালীন—অশুদ্ধ দেহ এবং অশুদ্ধ মন তখন থাকে না। কিন্তু সিদ্ধিলাভ হয় অঘাতী কর্ম্মের নিবৃত্তি হইতে। তখন বিশুদ্ধ দেহ এবং বিশুদ্ধ মনেরও লোপ ঘটে।

সেইরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মে অর্হৎ অথবা জীবন্মুক্ত ক্লেশ-সমূহ হইতে বিমুক্ত এবং সেইজন্য অশুদ্ধ মন হইতেও মুক্ত; কিন্তু ইহাই অর্হতের বিশেষত্ব নহে। কারণ শূন্যের ধ্যান করিয়া যাঁহারা নিরোধ-সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বীতরাগ কিংবা অনাগামী তাঁহাদের ক্লিষ্ট মন নিরুদ্ধ থাকে; কিন্তু উহা শোধিত নহে বলিয়া ব্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার উহার উদয় হয়। লোকোত্তর মার্গেও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ক্লিষ্ট মন নিষ্ক্রিয় থাকে। অর্হৎকেও পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে মৌদগলায়নের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মৌদগলায়ন একজন বড় যোগী ছিলেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথাপি তাঁহাকেও নিপীড়িত হইতে হইয়াছিল। দস্যুগণ তাঁহাকে টুকুরা টুকুরা করিয়া কাটিয়া তাঁহার অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণীকৃত করিয়াছিল। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে পূর্ব্ব-জন্মকৃত পিতৃহত্যারূপ গর্হিত কর্ম্মের ফলেই তাঁহার ঐরূপ দশা ঘটিয়াছিল।

* ইহার সহিত পতঞ্জলির জাতি, আয়ু এবং ভোগের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহা হইলে মায়ের যে দেহ এবং মন আছে বলিয়া প্রতীত হয় উহার কি কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে? ঐ দেহ-মন কি সেই পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যময়ী ইচ্ছাশক্তির লীলা হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া মনে করা চলে না? অথবা ভগবানের আবির্ভাবের জন্য যুগযুগান্তর ধরিয়া মানব জাতির যে আকূতি চলিয়া আসিতেছে ঐ সমষ্টি-আকূতিরূপ কর্ম্মের ফলরূপে সেই মহা-ইচ্ছার সাড়া হিসাবে ঐ দেহ-মন আবির্ভূত নয়, এ কথাই বা কে বলিতে পারে? তাহাই যদি হইয়া থাকে তবে দেহ এবং মন বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি মায়ের দেহ সেই দেহ নয়, মায়ের মন ও সেই মন নয়। এগুলি একান্তই আভাস মাত্র এবং ইহাদের অস্তিত্ব শুধু মায়ান্ধ অজ্ঞানীদের নিকট, যাহাদের দৃষ্টি আবরণের অন্তরালস্থিত সত্যরূপ দর্শনে সমর্থ নয়। এই দেহাদি দর্শন বস্তুতঃ মিথ্যা দর্শন বলিতেই হইবে—ইহা এড়াইবার কোন উপায় নাই। বুদ্ধ এবং যিশুখৃষ্টের দেহ সম্বন্ধেও আমরা কি এইরূপ শুনিতে পাই নাই? শ্রীকৃষ্ণ কি বলেন নাই যে তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম সাধারণ জীবের মত নহে, তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম উভয়ই দিব্য?

জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেহ-বোধ থাকিতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে মা নিজেই একবার বলিয়াছেন—

"জ্ঞানে আর সংশয়-সংসার থাকে না, দেহও থাকে না। সংসার থাকে না যেখানে দেহও থাকে না সেখানে। ... ... ... ... ... কে বলিল দেহ থাকে? নামরূপেরই কোন প্রশ্ন নাই। তাঁর দৃষ্টি আছে বা নাই তা'রও প্রশ্ন নাই। 'দেও' 'দেও' আর কা'র কাছে তাঁ'র? 'দেও' 'দেও' এই ভাবটাই ত দেহ। যে হেতু সংসার নাই, দেহ নাই, সেই হেতু

এই কর্ম্মও নাই, অর্থাৎ দেহ, সংসার, কর্ম্মের প্রশ্নই নাই,—একেবারে ধোয়া-মোছা, নাইও নাই। কথা বলাও যা' না বলাও তা'। চুপ করে যেখানে, চুপ না করেও সেখানে—যা' তা'।"

যাঁহারা জড়-অবস্থা হইতে অমর জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই এই কথা।* আর যাঁহাদের এই বদ্ধাবস্থা কোন কালেও ছিল না বা নাই তাঁহাদের বেলায় ঐ কথা আরও জোরের সহিত বলা যাইতে পারে।

( ৬ )

মায়ের ভাষা বোধগম্য নয় এইরূপ একটা অভিযোগ আমরা সচরাচর শুনিতে পাই। ভাষা বলিতে মা সকলের সহিত সাধারণ বাক্যালাপে বা চিঠিতে যে ভাষা ব্যবহার করেন তাহা লক্ষ্য করিয়া যদি ঐ অভিযোগ করা হইয়া থাকে তবে উহা একেবারেই ভিত্তিহীন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে 'মাতৃ-বাণী'র ভাষার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মায়ের শ্রীমুখে উচ্চারিত বাক্যের শ্রুতানুলিপি দ্বারা যে সকল চিঠি লিখিত হইয়াছিল তাহা হইতে 'মাতৃবাণী' সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, মাধুর্য্যময়, ঋজুতাপূর্ণ এবং ভাবগর্ভ। সাধনার গভীর অনুভূতি এবং নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইতে মা যে ভাষা প্রয়োগ করেন উহাই যদি ঐ অভিযোগের লক্ষ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হয় যে উহা কিয়দংশে যথার্থ। তবে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে অতিমানস স্তরের সত্যগুলিকে মনের অধোবর্ত্তী, এমন কি উর্দ্ধবর্ত্তী স্তরেও ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা দুরূহ। অথচ মনের ঐ দুই স্তরের সহিতই আমাদের ভাষার সম্বন্ধ। আমার মনে হয় যে সাধারণ পাঠকের বিচার-প্রবণ বুদ্ধির নিকট যাহা হেঁয়ালি বলিয়া প্রতীত হয় উহাই আবার চেতনার উর্দ্ধ স্তরে অতি সরল বলিয়া মনে হয়। ইহা বিশিষ্ট দার্শনিক এবং সাধুদিগেরও অভিমত। বিচার-দৃষ্টিতে এবং গণ্ডীবদ্ধ মনের নিকট যাহা পরস্পর বিরোধী, চেতনার পর্দ্দা খুলিয়া গেলে ও চেতনার ভূমি উর্দ্ধে উত্থিত হইলে ভূমার স্বচ্ছ আলোকে উহাই আবার স্বতঃসিদ্ধ অতি-পরিচিত সত্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

সুতরাং আমি মায়ের ঐ প্রকার কয়েকটি উক্তির বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে কি না তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ ঐ উক্তিগুলি অর্থশূন্য বলিয়া মনে হয়। মায়ের বহু সংখ্যক উক্তি হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপে মাত্র কয়েকটি গ্রহণ করা যাইতেছে। এগুলিকে উৎকৃষ্টতর সংজ্ঞার অভাবে আমরা জীবনের রহস্য এবং পরম তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে মায়ের দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন রূপে গ্রহণ করিতে পারি।

(১) যা' তা'। এই কথাটি ভাষান্তরে প্রকাশ করা সহজ নয়। সাধারণ ভাবে ইহাকে 'যা আছে তা'ই আছে' বলিয়াও ব্যক্ত করা যায়। অদ্বয় তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় মা এই জাতীয় বাক্য প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য

---

* যুবতী রাণী চূড়ালার জীবন-প্রসঙ্গেই ঐ কথা লিখিত হইয়াছে। চূড়ালা যোগ এবং জ্ঞান মার্গে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অজ্ঞ স্বামী শিখিধ্বজকে ঐ জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। কথা উঠিয়াছিল যে জ্ঞানলাভের পর চূড়ালা জাগতিক কার্য্যে সাক্ষিস্বরূপে না থাকিয়া কি করিয়া হস্তক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে মা বলিয়াছিলেন যে প্রকৃত জ্ঞান জাগতিক জীবন ভস্মীভূত করিয়া ফেলে এবং উহার সঙ্গে জাগতিক দেহও ভস্মীভূত হইয়া যায়।

ভাষার দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া প্রদর্শন করা সহজ নহে। লোকে তাঁহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাকে নিম্নলিখিত ভাবের দ্যোতক বলিয়া মনে করিতে পারেন—বিশুদ্ধ সত্তা, অসৎ বা অব্যক্ত, আত্মা, অপরিচ্ছিন্ন, বাঙ্-মনের অগোচর পরম সাম্য, নিরঞ্জন, অপরিণামী ইত্যাদি। "যা' তা'" বলিতে সেই অনির্দ্দেশ্য অনামীকেই বুঝায় যাঁহাকে বিভিন্ন নামে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, ইহা সেই অব্যক্ত অরূপকেই ইঙ্গিতে ধ্বনিত করে যাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্তভাবে প্রকাশিত হয়। মা ইহাকে "চরম-পরম"ও বলিয়া থাকেন। তখন ইহার অর্থ হয় পরমতত্ত্ব। এই দুর্ব্বোধ বাক্যটির তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য আমরা মার স্ব-মুখোচ্চারিত নিম্নলিখিত উক্তিগুলির সহিত ইহার তুলনা করিতে পারি—

(ক) "আছে, নাই, নাইও না, আছেও না, আরও আগে—যা' বল তা'ই। (খ) দুই বল, এক বল, অনন্ত বল, যে যা বলে সব ঠিক। (গ) দেওয়াল থেকেও নাই, না থেকেও আছে ঐ প্রকাশে। (ঘ) নাই আছে তাঁ'র মধ্যেই সম্ভব। (ঙ) তিনি রূপ ধরুন না ধরুন যা' তা'ই। (চ) সেই স্থিতিতে ঐ ভিন্ন আর কিছুই নাই—যা' তা'।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে ইহার মধ্যে ভেদের বা বিরোধের কোন অস্তিত্ব নাই,—এমন কি সৎ এবং অসৎ, আলো এবং অন্ধকার, ভাল এবং মন্দ, গতি এবং স্থিতি, পৌরুষেয় এবং অপৌরুষেয়—এগুলির মধ্যেও নাই। সমস্তই এক, একই সমস্ত। এগুলিকে সমপর্য্যায়ে ফেলার বা সমীকরণের কথা যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাও এখানে টিকে না, কারণ যেখানে সেই অদ্বয়ের কথা বলা হয় সেখানে যে এক বলিয়া বোধও নাই, অর্থাৎ থাকিয়াও না থাকার সমান। কথাগুলি আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু চরম সত্য ইহাই। নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন—

"শূন্যমিতি ন বক্তব্যমশূন্যমিতি বা ভবেৎ।
উভয়ং নোভয়ং চেতি প্রজ্ঞপ্ত্যর্থং তু কথ্যতে॥"

অর্থাৎ উহাকে শূন্যও বলা যায় না, অশূন্যও বলা যায় না, অথবা যুগপৎ শূন্যাশূন্যও বলা যায় না, অথবা উহাদের অতীত কিছুও বলা যায় না। ভাষায় যাহা প্রকাশ করা যায় উহা ভাব মাত্র এবং মানবীয় চেতনার ভাব-স্তর পর্য্যন্তই উহার আবেদন।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মকায় উপলক্ষ্য করিয়া মঞ্জুশ্রী পরমতত্ত্বের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাও এই জাতীয়। তিনি বলিয়াছেন—

যো নৈকো নাপ্যনেকঃ স্ব-পর-হিত-মহাসম্পদাধারভূতো
নৈবাভাবো ন ভাবঃ খমিব সমরসো দুর্বিভাব্যস্বভাবঃ।
নির্লেপং নির্ব্বিকারং শিবমসমসমং ব্যাপিনং নিষ্প্রপঞ্চং
বন্দে প্রত্যাত্মবেদ্যং তমহমনুপমং ধর্ম্মকায়ং জিনানাম্॥

অর্থাৎ ধর্ম্মকায় একও নহে, বহুও নহে। ইহা নিজ এবং পরহিতের মহাসম্পদাধার। ইহা সৎ বা অসৎ নয়। ইহা আকাশের মত সমরস। ইহার স্বভাব অচিন্তনীয়। ইহা কিছুতে আসক্ত হইয়া মলযুক্ত হয় না। ইহা নির্ব্বিকার। ইহা মঙ্গলময়, ইহা যুগপৎ সম এবং অসম। ইহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত এবং প্রপঞ্চাতীত।

কাশ্মীরের পরম যোগী অভিনব গুপ্ত হইতেও আমরা এই জাতীয় উক্তি পাই। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি গুরু তাঁহার আপ্তকাম শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"ভাবানাং ন সমুদ্ভবোঽস্তি সহজস্তদ্ভাবজা ভ্রান্তামী
নিঃসত্যামপি সত্যতামনুভবভ্রান্ত্যা ভজন্তি ক্ষণম্।

ত্বৎসঙ্কল্পজ এব বিশ্বমহিমা নাস্ত্যস্য জন্মান্যতঃ
তস্মাৎ ত্বং বিভবেন ভাসি ভুবনেষ্বেকোঽপ্যনেকাত্মকঃ ॥
যৎসত্যং যদসত্যমল্পবহুলং নিত্যং হ্যনিত্যঞ্চ যন্-
মায়াভির্মলিনং যদাত্মবিমলং চিদ্-দর্পণে রাজতে।
তৎ সর্ব্বং স্ববিমর্শসংবিদুদয়াদ্ রূপং প্রকাশাত্মকং
জ্ঞাত্বা স্বানুভবাধিরূঢ়মহিমা বিশ্বেশ্বরস্ত্বং স্মর।

অর্থাৎ বস্তুর সমুদ্ভব স্বতঃই হয় না, তোমার কল্পনার সম্প্রসারণ হইতেই তাহাদের উৎপত্তি। তাহারা অসত্য হইয়াও দৃশ্যতঃ অনুভূত হয় বলিয়া ক্ষণেকের জন্য সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। বিশ্বের এই মহিমা তোমার সঙ্কল্প হইতেই জাত। উহা ভিন্ন ইহার উৎপত্তির আর কোন স্থান নাই। এইজন্য তুমি এক হইয়াও এই সকল ভুবনে বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছ বলিয়া অনেকাত্মক। চিৎ-দর্পণে যাহা প্রতিভাত হয় তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, অল্পই হউক আর বহুই হউক, নিত্যই হউক আর অনিত্যই হউক, মায়া দ্বারা মলিনই হউক আর স্বরূপতঃ বিমলই হউক—এ সমস্তই স্বানুভবময় পরমজ্ঞানের উদয়ে প্রকাশাত্মক রূপে জানিয়া তুমি স্মরণ কর, কারণ হে বিশ্বেশ্বর, এই মহনীয় ঐশ্বর্য্য তোমার নিজ অনুভবে আরূঢ় হইয়া আছে।

যোগীরা নিমীলন এবং উন্মীলন—এই দুই প্রকার সমাধির কথা বলেন। প্রথমটিতে অভেদাত্মক অদ্বয় তত্ত্ব প্রকাশমান থাকে। এই যে একত্ব ইহা নির্ব্বিশেষ একত্ব। এরূপও বলা যায় যে এখানে একত্বের জ্ঞানও নাই। একই আছেন, কিন্তু তিনি জানেন না যে তিনি এক, অর্থাৎ এখানে শক্তির ক্রিয়া নাই। অন্যটিতে শক্তির খেলা নিরন্তর চলিতেছে, যাহার ফলে এক, একের মধ্যে বহু, বহুর মধ্যে এক এবং বহু—এই সমস্ত জ্ঞান উদ্ভূত হইতেছে। এই যে সমাধির দুই দিকের কথা বলা হইল প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা নিগূঢ় ভাবে একই। উভয়েই সমরূপে নিত্য এবং বাস্তবে একই সত্য প্রকাশ করে। এই অসীম মহাপ্রকাশ অত্যাশ্চর্য্যজনক। ঐ প্রকাশে সমস্ত বিরোধ বিগলিত হইয়া যায় এবং মনে হয় যেন আলো এবং অন্ধকার তাহাদের ভাবগত পার্থক্যও ঐ একত্বে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

(২) খেয়াল। মা কথা বলিতে বলিতে 'খেয়াল' শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ নির্ভুল ভাবে এবং সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিয়া নিরূপণ করা কঠিন। ইহা অন্তঃকরণের একটা অপ্রত্যাশিত আকস্মিক স্ফুরণ—ইহার আকার অহেতু-সম্ভূত রূপে প্রতীয়মান বাসনা, ইচ্ছা, একাগ্রতা, স্মৃতি, জ্ঞানাদি যে কোন চিত্তবৃত্তি হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই খেয়ালের সহিত একটা স্বতঃ-প্রবৃত্ত ভাব জড়িত আছে এবং উদ্দেশ্যহীন অব্যবস্থ চিত্তের খামখেয়ালির সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। শব্দটি মূলতঃ পারসীক হইলেও বঙ্গ-ভাষায় সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত। ঐ সূত্রেই মা বোধ হয় শব্দটি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু ইহাকে তিনি নিজস্ব এক অর্থে ব্যবহার করিয়া নিজ ভাবানুষঙ্গ দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

কেন যে এক বহু হয়, কেন যে সত্তা ও শক্তির সামরস্যময় অদ্বয় স্বরূপ নিজকে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টির মধ্যে অনন্তরূপে প্রকাশ পান, বিষয়ী কেন যে নিজেই নিজ ক্রিয়ার বিষয় হইয়া দাঁড়ান, যিনি অখণ্ড ও অবিভক্ত তিনি কেন যে নিজকে জ্ঞান-ক্রিয়াদির আশ্রয় এবং বিষয় রূপে বিভক্ত করেন—এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।

আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে ইহা পরম তত্ত্বের স্বাভাবিক ক্রিয়া নিবন্ধন, যাহাকে মা পরম পুরুষের 'খেয়াল' বলিয়া অভিহিত করেন। বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিও ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকেন—কেহ বলিয়াছেন যে ইহা ভগবানের স্বভাব, কারণ যিনি আপ্তকাম তাঁহার কোন স্পৃহা থাকিতে পারে না ( দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়ম্। আপ্তকামস্য কা স্পৃহা ? )। কেহ ইহাকে ক্রীড়া বলিয়াছেন (ক্রীড়ার্থং তো বালকস্যেব ক্রীড়াং তস্য নিশাময়)। কেহ ইহাকে লীলা বলিয়াছেন (লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্)। কেহ আবার ইহাকে ইচ্ছাও বলিয়াছেন, যে ইচ্ছা নিত্য চিৎ-সত্তার শুভ্র পটভূমিতে আনন্দ হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রিয়া রূপে বাহিরে প্রকাশ পায়। ইহাকে দৃষ্টিভেদে পরা বাণীও বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহা হইল হওয়ার ইচ্ছা, যদিও প্রকৃত পক্ষে এই স্থিতিতে ইচ্ছাও নাই, হওয়াও নাই। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-ধারায় ইহার বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন নামের যে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ তাহার সবই মায়ের খেয়াল শব্দটি দ্বারা দ্যোতিত হয়।

পরম সত্তা, যাহাকে মা 'চরম-পরম' বলেন, এবং উহার অন্তঃস্পন্দের বাহ্যস্ফুর্ত্তি, যাহাকে মা 'খেয়াল' বলেন, এই উভয়ের কথাই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। ভগবৎ-শক্তি প্রকৃত পক্ষে অচিন্ত্য। ইহা এক হইয়াও অনন্ত এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই যথাযোগ্য ক্রিয়া আছে।

কিন্তু এই সাধারণ সত্যটি আমাদের মনে রাখা উচিত যে প্রত্যেক শক্তিরই বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে অন্যান্য শক্তির প্রত্যেকটির সহিতই অভেদ-ভাব আছে। সুতরাং সকল শক্তিই অভিব্যক্ত প্রতি শক্তির মধ্যে অব্যক্তভাবে লীন হইয়া আছে। ইহা সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরেও যেমন সত্য, মূলেও সেইরূপ সত্য। তাহা হইলেও আমাদিগকে বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্লেষণ করিতে হইলে পরম সত্তার কয়েকটি মাত্র মূল শক্তির মধ্যেই আলোচনাকে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। এই সকল মূল শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা নিম্নে কিছু আলোচনা করিতেছি যাহার ফলে ভাগবত চেতনা-শক্তির বাহ্য দিকের ধারণা কতকটা সুগম হইতে পারে।

একদিক্ দিয়া দেখিলে এমনও বলা চলে যে পরমাত্মার মধ্যে যেমন সত্তা এবং চেতনার ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আছে, ঠিক ঐরূপ মনুষ্যের মধ্যেও আছে। যতক্ষণ মানব অহঙ্কার দ্বারা বিমূঢ় থাকে ততক্ষণ তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা হইতে যে সমস্ত কর্ম্ম বা যে সকল ক্রিয়া হয় তাহাদের প্রভাবে কর্মাশয় বা কর্ম-বীজ উদ্ভূত হয় এবং তাহার সুখ-দুঃখাদি রূপ ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হয়। সে ভগবৎ-প্রেরণা অনুভব না করিয়া নিজকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে বলিয়া ঐ কর্ম্মের ফলভোগ তাহাকেই করিতে হয়। কিন্তু সে যদি ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে যে তাহার নিজের কিছু করিবার শক্তি নাই, এমন কি যাহা সে নিজের ইচ্ছা বলিয়া মনে করে তাহাও তাহার নিজের নয়, উহা ভগবৎ-ইচ্ছারই বিকৃত প্রতিফলন মাত্র, তখন আর তাহার ক্রিয়মাণ কর্ম্মের নৈতিক দায়িত্ব থাকে না। সমস্ত জীব ও জগতের ব্যাপারের মূলে মানুষ যখন এক মহা-ইচ্ছার খেলা দেখিতে পায় তখন হইতেই তাহার জ্ঞানের উন্মেষ সূচিত হয়। ঐ দিকে আরও গভীর ভাবে লক্ষ্য করিলে সে দেখিতে পায় যে তাহার নিজের বলিয়া কোন ইচ্ছা বা উহার ছায়া পর্য্যন্তও নাই। ঐ অবস্থায় সে

ভগবৎ-চেতনার মধ্যেও কোন ইচ্ছা দেখিতে পায় না। কারণ যাহা তাহার মধ্যে নাই সে তাহা ভগবানের মধ্যে দেখিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে এখানে এমন একটি চমৎকার-পূর্ণ কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায় যাহা ইচ্ছারও অতীত। এই কেন্দ্রে ইচ্ছার উন্মেষ না থাকিলেও এখান হইতেই নিম্নের কেন্দ্রে ইচ্ছার উদয় হয়। ইহাই হইল অন্তরঙ্গা ভাগবতী শক্তির কেন্দ্র যেখান হইতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বহির্গত হয়—ইহাই আনন্দ এবং প্রেমের কেন্দ্র। ইহার পশ্চাতে নিরঞ্জন চিৎ বা স্বচ্ছতম ভাগবত আলোক মহাপ্রকাশ রূপে বিদ্যমান —সেখানে আনন্দ ও আত্মবিলোপনের দ্বারা নিজকে অতিক্রম করিয়া চিৎরূপে বিদ্যমান। ইহাই হইল পূর্ণ স্বরূপ-শক্তি যাহা স্বরূপের সহিত অদ্বয়, অপরিচ্ছিন্ন এবং নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। এখানে সমস্ত বিরোধ, সমস্ত দ্বন্দ্ব, তাহাদের বিরোধের বল হারাইয়া একের সহিত একীভূত হইয়া যায়।

ভগবানের ক্রিয়া-শক্তিকে মায়া বলা হয়—যাহা ঈশ্বরাধীন। আমরা যে স্থূল জগতের সহিত পরিচিত উহা মায়া হইতে উদ্ভূত। ইহা ঈশ্বরের অধীন এবং ঈশ্বরই ন্যায়াধীশরূপে ইহার শাসনকর্ত্তা ও জীবের কর্ম্মফল-প্রদাতা। জগতের ধর্ম্মরক্ষার ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত। পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার বা ভগবানের ন্যায়ের বিধান অর্থাৎ 'নিয়তি' এই জগতেই ক্রিয়াশীল। ইহাকে লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। মানুষ অজ্ঞান ও অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া কর্ম্মবীজ বপন করে যাহার ফল ঈশ্বর উক্ত বিধান অনুসারে প্রদান করেন। কেহ কেহ এরূপও বলেন যে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কর্ম্মই নিজের ফল নিজে উৎপাদন করে। কিন্তু প্রকৃতির এই নিয়ম বা বিধান চরম বিশ্লেষণে সেই অচিন্ত্য ভগবৎ-ইচ্ছারই অনুজ্ঞা বলিয়া প্রতীত হয়; কারণ প্রকৃতির অধ্যক্ষ ঈশ্বরই ধর্ম্ম বা নীতির স্বরূপ। এই অর্থেই ধর্ম্মকে বুদ্ধের সহিত, গুরু-বাক্যকে গুরুর সহিত ও বাক্ বা শব্দকে পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

এই যে ইচ্ছার কথা বলা হইল ইহা সাধারণ ইচ্ছা। ব্যক্তিগত বা বিশিষ্ট ইচ্ছার সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। যিনি অন্তর্দৃষ্টি বলে নিজ ব্যক্তিগত ইচ্ছার পশ্চাতে যাইতে পারেন তিনি ভগবৎ-ইচ্ছার মধ্যেই বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণের গুপ্ত বিধান দেখিতে পারেন, যাহা ব্যক্তিগত জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তিনি স্পষ্টই দেখিতে পান যে সামান্য ইচ্ছার মত বিশেষ ইচ্ছার স্থানও সেই মূলকেন্দ্রে। এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিলে ধর্ম্ম বা নীতির পরিপূরকরূপে ভগবান্‌কে প্রেমময় এবং মহাকরুণাময়রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এ কথা যদি সত্য হয় যে বিধি-লঙ্ঘনের জন্য দণ্ডের বিধান আছে এবং ধর্ম্ম-সংরক্ষণের দ্বারা অপরাধ মাত্রই গুরুত্ব হিসাবে উপযুক্ত শাস্তির যোগ্য, তবে এ কথাও সত্য যে অপরপক্ষে প্রেমের সহনশীলতা, নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অন্যের দোষ ক্ষালন, ক্ষমা এবং ত্যাগের দ্বারা সমন্বয়-প্রতিষ্ঠাও অবশ্য স্বীকার্য্য। এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। নীতিতে সামান্য ইচ্ছা ব্যক্ত হয়, প্রেম বা বিশেষ ইচ্ছার প্রয়োগ ঐ সামান্য ইচ্ছারই অনুপূরক ভাবে হয়। দুইই ইচ্ছার রূপ। ন্যায়ের সমতার সহিত উচ্ছলিত প্রেম ও স্বতঃ উচ্ছ্বাসময় করুণার কোন অসামঞ্জস্য নাই। শ্রীকৃষ্ণ কি গীতায় বলেন নাই যে সর্ব্বভূতের প্রতি তাঁহার সমভাব থাকিলেও যাহারা তাঁহাকে ভক্তির সহিত ভজনা করে তাহাদের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব আছে?

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

ইচ্ছা এবং ক্রিয়ার মধ্যে হইল জ্ঞানের স্থান, এই জ্ঞান আন্তর অনুভূতি রূপই হউক বা বুদ্ধিমূলকই হউক ইহার স্বরূপ বিচার বা বিমর্শন। ইহা জ্ঞান-শক্তির কার্য্য। বিচারের পরেই ক্রিয়া হয়। অন্য ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বিশেষ ইচ্ছার স্থান হইল অন্তরতম কেন্দ্রে, যেখান হইতে কৃপা এবং প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আর সামান্য ইচ্ছার কার্য্য হইল ন্যায়-অন্যায় বিচার করা ও বিচারানুসারে কার্য্য সম্পাদন করা। বিশেষ ইচ্ছা জ্ঞানের সাহায্যে বিচার করে এবং ক্রিয়ার সাহায্যে কার্য্য সম্পাদন করে। এইভাবেই জগতের শাসন-কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।*

এই বিশেষ ইচ্ছার ঊর্দ্ধে এমন এক কেন্দ্র আছে যেখানে ইচ্ছা বলিয়া কিছু নাই। সেখানে সমস্ত সৃষ্টিই বিলীন। ইচ্ছা হইতে সৃষ্টির আরম্ভ এবং উহার নিবৃত্তিতেই সৃষ্টির শেষ। ইহা ব্যক্তি-বিশেষের বেলায় যেমন, বিশ্বের বেলায়ও তেমনি। ইচ্ছার নিবৃত্তি হইলেই দিব্যানন্দের দ্বার খুলিয়া যায়। এই

---

* সকলেই জানেন যে মধ্যযুগের কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় অদ্বয় তত্ত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্নভাবে দেখিবার কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যায় যে তাঁহারা একদিকে স্বয়ং-ভগবান্ এবং ভগবানের ও অন্যদিকে ভগবান্ এবং পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য করিতেন। স্বয়ং-ভগবান্ এবং ভগবানের রাজ্যে জীব ও জগতের সৃষ্টিকারিণী তটস্থা ও মায়াশক্তির ক্রিয়া নাই। এখানে শুধু সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনীরূপা স্বরূপ-শক্তি সৎ চিৎ আনন্দরূপী স্বরূপের সহিত নিত্য-যুক্তভাবে বিরাজ করে। কিন্তু ভগবান্ বলিতে যেমন পরমপুরুষের ঐশ্বর্য্য এবং মহাকরুণার দিক্‌টা বুঝায়, স্বয়ং ভগবানে উহার সহিত আবার মাধুর্য্যময় সৌন্দর্য্য এবং প্রেম ও যুক্ত আছে। এই কারণেই স্বয়ং ভগবানের ধাম গোলোককে ভগবদ্ ধাম বৈকুণ্ঠ হইতে বিশিষ্ট বলা হইয়া থাকে। উভয়ই ভগবদ্-ধাম। ধাম হিসাবে বৈকুণ্ঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু গোলোক বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর, কারণ ইহা অতি গুহ্যতম প্রদেশ, যাহার অবস্থান ঊর্দ্ধতম ও অন্তরতম প্রদেশে। ইহা সর্ব্বদোষবিমুক্ত পৃথিবীর সহিত তুলনীয়। সেইরূপ বৈকুণ্ঠের অধিপতি হইলেন ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রকৃত পরমেশ্বর,—তিনি সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্যময়। আর গোলোকের অধিপতি হইলেন মানবরূপধারী, যিনি তাঁহার মানবতার মধ্যে নিজের পরম ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিয়া আছেন। আবার গোলোকের মধ্যেও গুহ্যতম কেন্দ্র হইল বৃন্দাবন, যেখানে মানবীয়ভাব এবং প্রেম লীলায়িত। গোলোকের অধিপতি হইলেন দিব্য মানব শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের যিনি দুলাল তিনি হইলেন শ্রেষ্ঠ মানব শ্রীকৃষ্ণ।

সেইরূপ ভগবান্ এবং পরমাত্মার মধ্যেও পার্থক্য আছে। মায়া এবং তটস্থ শক্তির সহিত ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; কিন্তু পরমাত্মা উভয়েরই নিয়ামক, যাহার ফলে জীব ও জগৎ প্রকাশিত এবং ক্রিয়াশীল। এখানেও গৌণভাবে স্বরূপশক্তি বিদ্যমান, কেননা উহা ভিন্ন জীব বা চিদণু সকলের প্রকাশ হইতে পারে না এবং পরমাত্মার ঈক্ষণ যাহা দ্বারা মায়ার সাম্যভাব বিক্ষুব্ধ হয় তাহাও হইতে পারে না। সৃষ্টির পরবর্ত্তী ইতিহাস—পৃথিবী এবং মনুষ্য পর্য্যন্ত সৃষ্টির ইতিহাস—পরমাত্মার চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত। ইহাদের উপরেই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন ও পরিচালন এবং বিশ্ব পরিচালনের যাবতীয় ভার ন্যস্ত। গৌণ কৃপা যাহা হইতে কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে এবং মুখ্য কৃপা যাহা হইতে নারায়ণের বৈকুণ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের গোলোক বা বৃন্দাবন-প্রাপ্তি ঘটে তাহা ঐ সকল ব্যূহের ঊর্দ্ধে অবস্থিত স্ব স্ব কেন্দ্র হইতে সঞ্চারিত হয়। এ সমস্ত লীলাই শক্তির ক্রিয়া। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম এই অভিন্ন ভাগবতী লীলার ও পরমাত্মার সৃষ্ট্যাদি অনন্ত প্রপঞ্চক্রিয়ার সাক্ষিস্বরূপে অসঙ্গভাবে নিত্য বর্ত্তমান। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে সাক্ষীও বলা যায় না, যদিও তিনি স্বয়ংপ্রকাশ।

দিব্য চেতনার মধ্যেই স্বরূপের সহিত আত্মার মিলন সংঘটিত হয়। দ্বৈতভূমির দৃষ্টিকোণ হইতে সন্তগণ যাহাকে 'আত্মিক উদ্বাহ' বলেন উহা শক্তি ও শক্তিমান্ বা আত্মা ও পরমাত্মার সংযোগের প্রতিচ্ছায়া মাত্র—ঐ স্থিতিতে আর বহির্মুখী প্রেরণা নাই। ইহা আত্মতৃপ্ত অবস্থা। এই আনন্দের পশ্চাতেই অনন্ত, স্বপ্রকাশ, অদ্বয় ও আত্মারাম চিৎ-প্রকাশের অনন্ত প্রসার। এই দুই-ই ( আনন্দ ও চিৎ ) স্বরূপ-শক্তির রূপ যাহা স্বরূপের সহিত অবিভাজ্যরূপে নিত্যমিলিত। অকুল পরমেশ্বর নিঃস্পন্দ, কিন্তু তাঁহার স্পন্দময়ী কুলশক্তি নিরন্তর ক্রিয়ারূপে উচ্ছলিত। ইহাও সত্য যে তুরীয়াতীত অবস্থায় উভয়ই এক এবং অভিন্ন।

মা যাহাকে খেয়াল বলেন তাহা ঐ মহা-ইচ্ছারই কোন বিশিষ্ট দিগভিমুখী স্বতঃস্ফূর্ত্ত পরিণতির রূপ। ইহা স্বাতন্ত্র্যময়ী এবং সাধারণতঃ পূর্বকল্পিত জাগতিক বিধানের সহিত অসংস্পৃষ্ট বলিয়া বিশেষ ইচ্ছারই অন্তর্গত। এখানে কোন বিধি-নিষেধ নাই এবং ইহার স্বচ্ছন্দ গতিতে বাধা দিবার মত কোন প্রতিবন্ধকও নাই। ইহাকে পূর্ব্ব-নির্দ্দেশাত্মক নিয়তির অভিব্যক্তিও মনে করা যায় না ; কারণ এখানে অতীত অনাগত বর্ত্তমান রূপে ত্রিধা-বিভক্ত কালের স্থিতি নাই। এখানে আছে শুধু নিত্য বর্ত্তমান। এখানে বাহ্য কিছুই টিকে না—কর্ম্ম, সুকৃতি, দুষ্কৃতি, অথবা ঐ জাতীয় কিছুর অর্থই এখানে নাই। ইহা জ্ঞানমূলক কি ক্রিয়ামূলক তাহাও স্পষ্ট ভাবে বলা কঠিন। আপাত দৃষ্টিতে উদ্দেশ্যশূন্য লীলা-খেলার চির নবীনতা ইহাতে দৃষ্ট হয় এবং ইহা অচিন্তনীয় সম্ভাব্যতা পূর্ণ।

(৩) 'যা হয়ে যায়'। এই বাক্যটি দ্বারা সাধারণতঃ ভগবৎবিধানকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার মানিয়া চলার ভাব বুঝায়। সর্ব্ব-নিয়ামক ভগবৎ-ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণের ভাব ও ইহাতে আছে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে মানুষ তাহা জানে না। সাধারণতঃ সে ইচ্ছা অনিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চলে। সে চায় যে ভবিষ্যতে যাহা হইবার তাহা যেন তাহার বাসনানুরূপই হয়। কিন্তু যখন সে এই ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিঃশব্দে এবং সানন্দে যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হয় তখনই তাহার নির্ভরভাবের সূচনা হয়। সর্ব্বাবস্থায় মনের এই নির্ব্বিকার ভাব মানুষকে প্রকৃত স্বচ্ছন্দতা দান করে। কারণ ইহা বহিঃশক্তিগুলিকে মনের এই সমতা বিক্ষুব্ধ করিতে দেয় না। কেবল তাহাই নহে, ইহা মানুষকে এতখানি সবল করে যে সে দুঃখকেও আনন্দরূপে স্বাগত করিতে পারে। মানুষের জীবনে এবং বিশ্বে যাহা কিছু ঘটে তাহা ভগবৎ-ইচ্ছায়ই ঘটিয়া থাকে এবং ঘটনা যে ভাবেই প্রভাবান্বিত হউক না কেন যে হেতু এই ইচ্ছাকে ন্যায়ানুগত এবং মঙ্গলজনক বলিয়া বিশ্বাস করা হয় সেইজন্য লোকে নিজ নিজ জীবনে এবং বিশ্বে যাহা কিছু ঘটে তাহা সানন্দে গ্রহণ করিতে পারে।

'যা হয়ে যায়' কথাটি ভগবৎ-বিধানের নিকট নিষ্ক্রিয় ভাবে এবং সজ্ঞানে নতি-স্বীকার ও বুঝায়। তবে ইহা মায়ের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বলিয়া ইহাকে দায়ে পড়িয়া ভবিতব্যের নিকট আত্মসমর্পণ বলা যায় না।

(৭)

মা বলেন যে সমস্ত সম্প্রদায়ের এবং সমস্ত আচার্য্যের উপদেশই আপন আপন দৃষ্টিকোণানুসারে সত্য, তবে উহা খাঁটি এবং ঠিক স্থান হইতে নির্গত হওয়া চাই। যাহাদিগকে এই উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহাদের পক্ষে ইহা অবশ্য পালনীয়। উপদেশ গুলি পরস্পর বিরোধী হইলেও পথ হিসাবে, অর্থাৎ যাহাদের উদ্দেশে উহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট

লক্ষ্যে পৌঁছাইবার উপায় রূপে যে ইহাদের বিশেষ মূল্য আছে তাহার হ্রাস হয় না। যদি উপদিষ্ট মার্গটি পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি পূর্ণ থাকে ও উহার মধ্যে যাত্রার শেষ পর্য্যন্ত কোন অবরোধ না থাকে তাহা হইলে উহা দ্বারা কেহ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে না। তবে হয়ত উহা যাত্রীকে পূর্ণ সত্যে না পৌঁছাইয়া কোন খণ্ড সত্যে পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু যাত্রীর যদি পূর্ণ সত্য-প্রাপ্তির স্পৃহা আন্তরিক হয় তবে পরম সত্যই চলার পথে তাহার নিকট যে কোন মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ করিবে। তখন হয় ঐ খণ্ড সত্যই পূর্ণ সত্যের সহিত যোগযুক্ত হইয়া উহার অঙ্গরূপে উহাকে পাওয়ার সহায়ক হইবে, অথবা উহা রূপান্তরিত হইয়া পূর্ণ সত্যের আত্ম-প্রকাশের একটি আধার বা নিমিত্ত রূপে পরিগণিত হইবে।

চরম সত্য এক এবং উহা প্রাপ্তির পথ ও এক। বৈরাগ্যবান্ অকৃত্রিম সাধকের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। তাই প্রথমে চাই পবিত্রতা, ভক্তি এবং ত্যাগের ভাবে অনুপ্রাণিত জীবন। তারপর আবশ্যক অটুট ধৈর্য্য, সুদৃঢ় সঙ্কল্প, বিরামহীন চেষ্টা, ভগবৎ কৃপায় অটল বিশ্বাস এবং ভগবৎ ইচ্ছার নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ।

মায়ের নিজের কোন পথ নাই, কোন বিশেষ শিক্ষা বা মতবাদ নাই। তিনি জানেন যে ভগবান্ লাভের পথ মূলতঃ এক হইলেও ব্যক্তিগত রুচি এবং আধার অনুসারে উহা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। দেহ ও মনের ক্রমিক বিশুদ্ধি, জ্ঞান লাভ এবং জীবাত্মার রূপান্তর সাধন ( যাহার ফলে জীব পরিণামে ভগবৎ-সত্তার সহিত নিজের লুপ্ত একত্ব ফিরিয়া পাইতে পারে ) —ইহাই হইল আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি লাভের প্রকৃত পরীক্ষা। প্রত্যাদেশ, দিব্য দর্শন, দিব্য শ্রুতি ও অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন প্রভৃতি তথা-কথিত ভগবদনুগ্রহমুলক আত্মিক শক্তি লাভের বিরুদ্ধে বলিতে গিয়া মা কখন কখন মুখর হইয়া উঠেন। ইহার অর্থ ইহা নয় যে ঐগুলি সর্ব্বাবস্থায়ই হেয় বা বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই গুলির প্রতি আকর্ষণ-বোধ থাকিলে সাধারণতঃ আমাদিগের পক্ষে প্রকৃষ্ট লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা জন্মে। এ পথে চলিতে হইলে সেই মহান্ লক্ষ্যের প্রতি অনন্যমনা এবং একাগ্রদৃষ্টি-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কাহারও ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর মা পরোক্ষ ভাবে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন না। শ্রীঅরবিন্দ যাহাকে "মিথ্যা চটকের অধিত্যকা" বলিয়াছেন মা আমাদিগকে শুধু উহা হইতে সাবধান থাকিতে বলেন। সাধারণতঃ এই সকল অনুভূতি বিকৃত কল্পনা অথবা বাহ্যশক্তির ক্রিয়া হইতে আসিয়া থাকে—এই সকল শক্তি প্রায়ই প্রতিকূল, অন্ততঃ অনুকুল নহে। এই পথে যে আত্ম-প্রতারণার সম্ভাবনা খুব অধিক মা তাহা দেখাইয়া থাকেন। এই জাতীয় শক্তিলাভ কদাচিৎ খাঁটি, বরণীয় এবং ঐ পথের সহায়ক হয়। যে ক্ষেত্রে হয় সেখানে ঐগুলিকে থাকিতে দিলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু সে স্থলেও যে পর্য্যন্ত সাধক নিজকে বাহ্য প্রভাব হইতে সুরক্ষিত মনে না করেন ততক্ষণ উহাদের সহিত সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা উচিত নহে। ইহা মনে রাখা খুবই দরকার যে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, আত্মবোধ এবং সদসৎ-বিচার-শক্তিকে যেন খর্ব্ব করা না হয়।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে মা যে সকলের প্রতি সহনশীল তাহার অর্থ বুঝা যায়। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের এবং প্রত্যেক ঘটনার উজ্জ্বল

দিক্‌টা দেখিয়া থাকেন এবং সকলকেই তাহাদের সাধ্যানুসারে ঐরূপ করিতে বলেন। প্রত্যেক জিনিষেরই সার্থকতা এবং গুরুত্ব আছে। সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক্ পৃথক্। একজন তাহার দৃষ্টিকোণ হইতে যাহা বলে তাহা যেমন সত্য, অপরে আবার তাহার নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে যাহা বলে তাহাও তেমনি সত্য হইতে পারে। অপরের সহিত কথা বলিতে মা তাহাদের দৃষ্টিকোণ হইতেই বলিয়া থাকেন যেন তাহারা তাঁহার কথা ভালভাবে বুঝিতে পারে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে মায়ের নিকট কেহই অপরিচিত নহে। মায়ের বিশ্বব্যাপী সমবেদনা ও করুণার ইহাই রহস্য। বিভিন্ন লোকের রুচি এবং জ্ঞান-সংস্কারের পৃষ্ঠভূমি বিভিন্ন বলিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন পথে চালনা করা আবশ্যক, ইহা মার নিজের ব্যবহার হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়।

একজন জগৎগুরু বলিয়াছেন, "আমার পিতার অর্থাৎ বিশ্বপিতার ভবনে অনেক প্রাসাদ আছে।" মাও বলেন যে সত্যই অনন্ত প্রাসাদ আছে এবং প্রতি প্রাসাদে যাইবার পথ ও অনন্ত; কিন্তু তাহা সত্ত্বে ও মা জোর দিয়া বলেন যে আমরা যেন ভূলিয়া না যাই যে ভবন কিন্তু একটিই। সমস্ত জীবই ঐ একই ভবনে বাস করে এবং সকলেই একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা সকলেই এক হইতে উদ্ভূত, একেরই অংশ এবং বাস্তবিক পক্ষে একই। পার্থক্য যাহা কিছু দেখা যায় তাহা বাহ্য এবং মায়িক; কিন্তু ইহাও তত্বতঃ সেই একেরই খেলা। আমরা যখন নিজেকে ফিরিয়া পাইব তখন আমরা ইহার যথার্থতা বোধ করিতে বাধ্য হইব। যদিও মা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তথাপি তিনি সর্ব্বদাই জানেন যে তিনি এক স্থানেই আছেন—গতি এবং স্থিতি, নানা এবং এক তাঁহার চেতনায় সহচারিরূপে যুগপৎ বর্ত্তমান। ঐগুলি একই পরম তত্ত্বের বিভিন্ন দিক্। প্রকৃতপক্ষে দিক্‌ই বা কোথায়? পরমতত্ব দিগ্বিভাগশূন্য, গণ্ডী-বন্ধনহীন, এক ও অভিন্ন।

এই কারণেই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এবং বিভিন্ন বিশ্বাসের লোক, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুপরিজ্ঞাত ব্যক্তিগত কারণে মাকে তাঁহাদের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক বলিয়া মনে করেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তির, এক কথায় আধ্যাত্মিকজীবনের সমস্ত ধারারই, শ্রেষ্ঠ সমর্থক মা। ঐ গুলির প্রত্যেকটির সার্থকতা, উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এবং উহাদের মধ্যে সবগুলিই যে যুগপৎ ক্রিয়াশীল তাহা মা বেশ জানেন। আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তরগুলি মায়ের সুপরিজ্ঞাত, তথাপি মা অধিকারী বুঝিয়া বেশ জোরের সহিত বলিয়া থাকেন যে ভগবানের সর্ব্বব্যাপক পূর্ণ প্রকাশ অকস্মাৎ একটি মহাক্ষণে হইয়া থাকে। ইহা কালের ব্যাপার নহে এবং ক্রমধর্ম্ম-বিশিষ্ট কালের রাজ্যে ঘটে না। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলি যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধযুক্ত তাহা মা প্রাকৃতিক ঘটনার সহিত উপমা দিয়া বুঝাইয়া থাকেন আবার ভগবৎ-স্বাতন্ত্র্যের মহিমা যে বিধি-নিষেধের উর্দ্ধে তাহাও তিনি জোরের সহিত ঘোষণা করেন। গুরুর প্রয়োজনীয়তার উপর মা জোর দিয়া থাকেন, আবার গুরু যে অপরিহার্য্য নয় এ কথাও তিনি স্বীকার করেন। মা তাঁহার অনুপম ভঙ্গীতে এই বলিয়া সমস্ত বিরোধের সমাধান করিয়া থাকেন যে সমস্ত ভেদ ও বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক সত্যই স্ব-গৌরবে প্রকাশমান থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেক স্থিতিরই বলাধান করিতেছেন।

এই ভূমিকার স্বল্প পরিসরের মধ্যে মায়ের উপদেশ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার অবকাশ নাই,

কারণ ইতিমধ্যেই ইহা ইহার নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়াছে। *

মায়ের সকল উক্তিই গভীর অর্থপূর্ণ। অসতর্ক পাঠকের নিকট উহাদের কোন কোনটি হয়ত কতকটা অস্পষ্ট। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ ধারণা করা সঙ্গত হইবে না যে মা সহজ ভাষায় কথা বলিতে পারেন না। লোকেরা বিপদ্-গ্রস্ত কিংবা কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মায়ের উপদেশ এবং আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলে মা তাহাদিগকে সরল, স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং জ্ঞান-প্রেমোজ্জ্বল ভাষাতেই উপদেশ দিয়া থাকেন।

যাহা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে উহা হইতে মায়ের জীবন এবং উপদেশের সারাংশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের স্বল্প জ্ঞান লইয়া মায়ের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। অনুমান এবং কল্পনার ঊর্দ্ধে উঠিয়া সত্যের হৃদয় আমাদিগকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করিতে হইবে। আমাদের কর্ত্তব্য হইবে মাকে মায়ের মতই ভালবাসা —গভীর এবং আন্তরিক ভাবে এবং ঐ ভাবে ভাল বাসিতে বাসিতেই মায়ের প্রকৃত স্বরূপের সহিত আমাদিগকে ক্রমশঃ গাঢ় ভাবে মিলিভ করিতে চেষ্টা করা। ইহা আমি বহু বর্ষ পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও করিতেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ঐরূপ করিলেই মা আমাদের আধার এবং যোগ্যতা অনুসারে আমাদিগের নিকট তাঁহার স্বরূপ পূর্ণতর ভাবে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন। তখন মা যে কি তাহা অপরোক্ষ ভাবে জানিবার সৌভাগ্য আমাদের লাভ হইবে। ঐ জানা তখন বুদ্ধির সাহায্যে জানার মত হইবে না ; কারণ বুদ্ধি আবরণের ভিতর দিয়া দেখে বলিয়া যাহা দেখে তাহাকেও বিকৃত করিয়া ফেলে। মাকে ঐ ভাবে জানিতে পারিলে আমরা নিজকেও জানিতে পারিব। জগতে যে এত বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধ দেখা যায় যাহার ফলে তিক্ততা এবং সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, উহার কারণই হইল আমাদের সহানুভূতি এবং একত্ব-জ্ঞানের অভাব। আত্ম-জ্ঞানের অভাবই হইল মূল কারণ। বিশ্বে একই মাত্র আত্মা বিরাজ করিতেছেন, যাহা চির জ্ঞানময় ও প্রেমময়। উহাকে যথার্থ ভাবে জানিতে পারিলেই আমরা উহার সহিত অবিভক্ত-ভাবে যুক্ত হইয়া উহার অংশ হইব। তখন বিদ্বেষ এবং বিরোধের বাষ্প-জাল সবিতার কিরণের সম্মুখে কুজ্ঝটিকার মত দূরীভূত হইতে বাধ্য হইবে। একত্ব-বোধ এবং প্রেম দ্বারা জীবের চিন্তা এবং কার্য্য যখন নিয়ন্ত্রিত হইবে তখনই বিশ্বে নব-জীবনের সূত্রপাত হইবে। মার আশীর্ব্বাদে সেই গৌরবময় দিন আসন্ন হউক এবং মা মানব-জাতির উপর কৃপা বর্ষণ করুন —ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

* পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা মায়ের উপদেশ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে অভীপ্সু, তাঁহারা কাশী, ভাদাইনী আনন্দময়ী আশ্রম হইতে প্রকাশিত "আনন্দবার্ত্তায়" ধারাবাহিক-ভাবে লিপিবদ্ধ 'মাতৃবাণী' এবং 'অমরবাণী' দেখিতে পারেন। প্রথমটিতে মায়ের উপদেশ তাঁহার চিঠি হইতে সঙ্কলিত করা হইয়াছে। ঐগুলি সান্ত্বনাপ্রার্থী ভক্তদিগকে মা লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টিতে সাধকের আধ্যাত্মিক জীবনের নানাবিধ দার্শনিক সমস্যার সমাধান আছে। ঐ সকল সমস্যা প্রশ্নাকারে মাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—অশুদ্ধি শোধন : পৃ ১৮, পং ৪— 'সঞ্চালিত' স্থানে 'সম্ভাবিত' হইবে।

# সিদ্ধ পুরুষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

( ১ )

আমাদের দেশে সকলেই বাল্যকাল হইতে সিদ্ধ পুরুষের কথা শুনিয়া আসিয়াছে। সিদ্ধ পুরুষ কাহাকে বলে তাহা না জানিলেও তাহাদের সাধারণ ধারণা এই যে, মানুষ নিজের জীবনে এমন একটি অলৌকিক অবস্থা লাভ করিতে পারে যখন সে আর সাধারণ মানুষ থাকে না—তাহার অলৌকিক শক্তি লাভ হয় এবং সে মনুষ্য-জীবনের একটি মহান্ আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া জীবনের পথে অনেকটা পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে। যে কোন সাধনায় সফল হইলেই সাধককে সিদ্ধ বলা যাইতে পারে ইহা সত্য, কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ বলিতে সাধারণতঃ লোকে ঐ সকল পুরুষকে লক্ষ্য করে না। প্রাচীন কালে চুরাশী জন সিদ্ধ পুরুষের কথা সাহিত্যে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সিদ্ধ পুরুষের সংখ্যা অনন্ত।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সিদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। সিদ্ধাবস্থা লাভের উপায় সকল ধর্ম্মেই আছে। সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় খৃষ্টীয়, সুফী, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়েও সিদ্ধ পুরুষ আছেন। কি প্রকারে মনুষ্য প্রকৃত সিদ্ধ পদবীতে আরূঢ় হইতে পারে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

( ২ )

সমগ্র সৃষ্টি অথবা বিশ্বের মূলে এমন একটি মহাশক্তিধর সত্তা আছেন যাঁহাকে অদ্বৈত ও অখণ্ড না বলিয়া পারা যায় না। এই সত্তাটি চৈতন্য-স্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ—ইহাতে অনন্ত প্রকার অনন্ত শক্তি অভিন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে। ইনি এক ও অদ্বিতীয়, অনাদি ও অনন্ত, এবং অক্ষত ও নির্ব্বিকার—ইনি পূর্ণ সত্যস্বরূপ। দেশ কাল ও নিমিত্ত ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কার্য্য-কারণ-ভাবের নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা ইনি নিয়ন্ত্রিত হন না। মনুষ্য জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার সহিত পরিচিত, কিন্তু পূর্ণ সত্য অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপ এই ত্রিবিধ অবস্থায় পাত্রে পারদবৎ থাকিয়াও ঊর্দ্ধে নিত্যই অতি-চেতন অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। এই অতিচেতন অবস্থা চৈতন্যেরই অবস্থা। ইহাকে তুরীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে—ইহা অপ্রতিহত এবং নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষাৎকারাত্মক প্রকাশের অবস্থা। কিন্তু ইহার পরে এমন একটি গভীর অবস্থা আছে যেখানে বোধেরও উন্মেষ নাই এবং যেখানে বোধ-সহকারে প্রবেশ করাও যায় না। বস্তুতঃ ইহা কোন অবস্থাই নহে, একটি স্থিতি মাত্র। অতিচেতন অবস্থারও অতীত বলিয়া ইহাকে এক হিসাবে অচেতন অবস্থা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহা অচেতন অবস্থা নহে, বরং চৈতন্যের ঘনীভূত অবস্থা। ইহা প্রকাশের ঘনীভূত অপ্রকাশ। ইহা আপাতদৃষ্টিতে জড় বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ ইহা জড় ও চেতন এই দ্বন্দ্বভাবের অতীত। ইহাই ভগবানের স্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তি থাকিলেও

এই স্থিতি হইতে ঐ সকল শক্তির প্রয়োগ সূক্ষ্ম বা স্থূল কোন স্তরেই হয় না। যিনি পূর্ণ সত্য, যিনি সত্যের অপার ও অতল প্রকাশ, তিনি নিজে তৎস্বরূপ হইয়াও তাহা যেন জানেন না। এই স্থিতি কিয়দংশে আমাদের পরিচিত গভীর সুষুপ্তির অনুরূপ।

( ৩ )

কিন্তু এই স্থিতি হইতে জগতের সৃষ্টি হয় না। যাঁহাকে আমরা জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করি তিনি এই পূর্ণ সত্য হইতে অভিন্ন হইলেও চেতন পুরুষ। তিনি নিরন্তর সৃষ্টি ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন এবং সে বোধও তাঁহার আছে। কিন্তু তিনিই যে অখণ্ড অনন্ত পরম তত্ত্ব তাহা সৃষ্টি-কর্ত্তা রূপে তিনি যেন জানেন না এবং তাহা জানিবার প্রয়োজনও যেন হয় না। মনুষ্য সিদ্ধাবস্থাতে যে পূর্ণত্ব লাভ করে তাহার সঙ্গেও তাঁহার যেন কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহার একমাত্র সম্বন্ধ সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারের সহিত। এই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর দেশ ও কালের অতীত নহেন এবং কার্য্য-কারণ-ভাবের সহিত সুপরিচিত। তাঁহার বোধ-কেন্দ্র হইতেই অনন্ত বিশ্বের নির্গম হইয়া থাকে। যতদিন তিনি ক্রিয়াশীল থাকেন সেই সময়-পরিমাণকে এক হিসাবে কল্প বা মহাকল্প নাম দেওয়া যাইতে পারে। সমস্ত বিশ্বই তাঁহার কর্ম্মের ক্ষেত্র।

যাহাকে আমরা জীব বলিয়া বর্ণনা করি তাহাকেও পূর্ণ সত্য হইতে পৃথক্ বলা চলে না। ঈশ্বরও পূর্ণ হইতে ভিন্ন নহেন এবং জীবও ভিন্ন নহে, কিন্তু ঈশ্বর চেতন এবং জীব আংশিক ভাবে চেতন ও আংশিক ভাবে অচেতন। জীব তাহার ক্ষুদ্র অহংটিকে জানে, কিন্তু সে নিজেই যে বাস্তবিক পক্ষে আত্মা—যাহা অনন্ত এবং অখণ্ড—তাহা সে জানে না। দেশ ও কাল এবং কার্য্য-কারণ-ভাবের নিয়ম জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জীবও পূর্ব্ববর্ণিত কল্প বা মহাকল্প পর্য্যন্ত অবস্থান করে, তাহার পর সে নিজকে পূর্ণের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পূর্ণরূপে স্থিতি লাভ করে। আত্ম-স্বরূপের সহিত মন প্রাণ প্রভৃতি উপাধির যোগ হইলে জীবরূপে আত্মার আবির্ভাব হয়। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করিতে হইলে উপাধি-মূলক এই জীবভাবটি ত্যাগ করিতে হইবে। শুধু মৃত্যুর ফলে এই অবস্থার প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। কারণ জাগতিক বাসনা থাকা পর্য্যন্ত মৃত্যুর পরেও জীব-ভাব কাটে না এবং পূর্ণভাবে বাসনা কাটিয়া গেলে দেহ থাকিতেও মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়। এই সকল বাসনা বা সংস্কারকে জ্ঞান পূর্ব্বক রোধ করিতে হইবে। মনুষ্যের চিত্ত এই সকল সংস্কারের দ্বারা সর্ব্বদাই অনুবিদ্ধ থাকে বলিয়া চৈতন্য নিজেকে নিজে উপলব্ধি করিতে পারে না। জ্ঞানপূর্ব্বক এই সকল সংস্কারকে মুছিয়া ফেলিতে পারিলে প্রকৃত সত্য-দর্শন প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর। জীব-ভাব-বর্জ্জিত আত্মা বস্তুতঃ শুদ্ধ আত্মা ভিন্ন অপর কিছু নহে। সুতরাং জীবনের ধারা থাকিতে থাকিতেই জীব-ভাবের অতীত হওয়া আবশ্যক। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই এই যে বোধাতীত পরম তত্ত্বকে বোধে ধারণ করিয়া সংসারের এবং দেহের যাবতীয় বাসনা বর্জ্জন করিতে হইবে। প্রতি মনুষ্যই নিদ্রাকালে বাসনা বর্জ্জন করিয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু ইহা জ্ঞান পূর্ব্বক করে না, কিন্তু অচেতন ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে করিয়া থাকে। তাই তাহাকে পুনর্ব্বার উঠিতে হয়। এইজন্য নিদ্রা অথবা সাধারণ মৃত্যু সকল মনুষ্যের প্রকৃত কাজে আসে না, গভীর নিদ্রাতেও কিছু না

কিছু ত্রুটি থাকিয়াই যায়। কারণ যদিও নিদ্রাতে মনুষ্যের দেহ-স্মৃতি থাকে না তথাপি জাগিয়া উঠিলে সেই স্মৃতি পুনর্ব্বার ফুটিয়া উঠে। এই গভীর নিদ্রা মৃত্যুর ফলে ঘটিয়া থাকে। তখন জাগিয়া উঠিয়া জীব দেখিতে পায় যে সে নূতন দেহে নূতন আবেষ্টনের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব-স্মৃতির রক্ষা হয় না বলিয়া নূতন বলিয়া বুঝিতে পারে না। এইজন্য যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে মরিয়া মরা নিষ্ফল, কিন্তু জীয়ন্তে মরা আবশ্যক। জীয়ন্তে মরা কাহাকে বলে? বোধাতীত অবস্থায় বোধ সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করা, ইহাই জীয়ন্তে মরা। এই অবস্থায় একদিকে লিঙ্গহীন নির্ম্মল আত্ম-স্বরূপের পূর্ণ বোধ জাগিয়া থাকে ও অন্যদিকে দেহ মন ও বিশ্বের চেতনা থাকে না।

( ৪ )

জীব মায়া-জাল ভেদ করিয়া সৃষ্টিকে ভেদ করিতে পারিলে নিজকেই শিবরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাই তাহার জীবনের সার্থকতা। সে তখন তাহার নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে। ইহাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তাহার নিকট স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভেদ অর্থাৎ জীব জগৎ ও ঈশ্বরের ভেদ আর থাকে না। সে আর পূর্ব্বের ন্যায় তখন দেশ কাল ও নিয়তির অধীন থাকে না। সে তখন নিজকেই সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণসত্য বলিয়া চিনিতে পারে। তাহার এই স্থিতি আর কখনও ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কোনও প্রকার জাগতিক পরিবর্ত্তন তাহাকে আর বিচলিত করিতে পারে না। সে বুঝিতে পারে যে, সে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম সকলের মধ্যে যেমন ছিল তেমনি এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় সত্তাতেও ছিল। ছিল কেন?—আছে। কিন্তু ইহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে ইহা তাহার বোধগম্য হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ পরম তত্ত্বের সহিত জ্ঞান ও চৈতন্যের যোগ হওয়াতে এই অবস্থার উদয় হইয়াছে। ইহাই সিদ্ধাবস্থা। ইহা নিত্য জাগ্রৎ অবস্থা। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, দ্রষ্টা দৃশ্য ও দৃষ্টি এবং প্রেমিক প্রেমপাত্রও প্রেম এখানে অভিন্ন। একমাত্র সিদ্ধ পুরুষই এই অদ্বয় স্থিতি অনুভব করিতে সমর্থ। অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান তিন কালেই তিনি এক। বস্তুতঃ সকলেই তাহাই, কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় তাহা বুঝিতে পারে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে এক পরমাত্মাই পরম তত্ত্ব—ঈশ্বর জীব ও সিদ্ধ পুরুষ রূপে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রকার খেলা করিতেছেন। পরমাত্মা অবস্থায় পরমতত্ত্ব এক অখণ্ড ও অনন্ত স্বরূপে জ্ঞানের অগোচর ভাবে অনন্ত শক্তি, অনন্ত সত্তা ও অনন্ত চৈতন্য ধারণ করিয়া আছেন। ঈশ্বররূপে এই সকল শক্তিই তাঁহার আছে, কিন্তু তিনি শুধু বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার ব্যাপার অনুভব করিতেছেন। জীব রূপেও তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, কিন্তু নিজেকে বাসনা দ্বারা বদ্ধ করিয়া সীমাবদ্ধরূপে অনুভব করিতেছেন। তাহার সিদ্ধ অবস্থাটি সেবাত্মক অবস্থা। একমাত্র এই অবস্থায় তিনি চেতনভাবে তাঁহার অনন্ত শক্তির সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন।

( ৫ )

এই যে সিদ্ধাবস্থার কথা বলা হইল ইহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পরের অবস্থা। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার বলিতে শুধু ভগবদ্-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান বুঝায় না—ইহা প্রকৃতই ভগবানের সহিত যুক্ত অবস্থা। এই অবস্থার প্রাপ্তি না ঘটিলে কোন

সাধককেই যোগী বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। এই অবস্থায় জীব নিজের পৃথক্ সত্তাবোধ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্ব প্রকার দ্বৈত ভাবকে অতিক্রম করে। পরমাত্মার সহিত তাহার যে তাদাত্ম্য রহিয়াছে তাহার স্থায়ী জ্ঞান তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। জীব যদিও তখন উপলব্ধি করে যে, এই অবস্থা তাহার অনাদিকাল হইতেই ছিল তথাপি সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে ইহা তাহার বোধগম্য এবং আস্বাদনের বিষয় রূপে ছিল না, ইহা বলিতেই হইবে। যে অসীম এবং অব্যাহত আনন্দ সিদ্ধ পুরুষগণ অনুভব করেন তাহা কোন অভূতপূর্ব্ব বস্তু নহে। তাহা পরমাত্মস্বরূপে অনাদিকাল হইতেই ছিল, কিন্তু সাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহার প্রকাশ হয় নাই। সাধক সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইলে ইহা মনে করা চলে না যে, সে কোন একটি পৃথক্ স্বরূপ প্রাপ্ত হইল—সে পূর্ব্বেও যাহা ছিল তখনও তাহাই থাকে। তাহার স্বরূপের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। তবে যাহা পূর্ব্বে সে জানিত না, সাক্ষাৎকারের পরে সে তাহা জানিতে পারে, ইহাই মাত্র ভেদ। অনাদিকাল হইতে এই যে ক্রম-বিকাশের খেলা চলিতেছে ইহা একটি খেলা মাত্র। ইহা মায়ার বিলাস, ইহার কোনই বাস্তবিক সত্তা নাই। ইহা আত্মহারা জীবের নিজেকে ফিরিয়া পাইবার কৌশল মাত্র।

জগতের মায়াজালে জীব আবদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া এই খেলাটি সময় সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে। মায়াজালে জড়িত হইবার মূল কারণ জীবের অহঙ্কার। জীব প্রথমাবস্থায় অহঙ্কার-শূন্যই থাকে, কিন্তু তাহার চৈতন্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের বিকাশ হয়। এই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াই মোহ অথবা অবিদ্যা গুপ্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে। ইহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। জীবের নিজ স্বরূপে অনন্ত জ্ঞান নিহিত থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তির পথে ইহাই একমাত্র বাধক। গভীর নিদ্রার সময় জীব পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য উপভোগ করে, কিন্তু এই উপভোগের সচেতন অনুভব হয় না। সুষুপ্তি কালে জগতের ভ্রম অল্প সময়ের জন্য তিরোহিত হয়, কারণ তখন চেতনা স্তম্ভিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও ভগবান্ বা আত্মস্বরূপের সচেতন অনুভূতি ফুটে না, কারণ অহঙ্কার সম্পূর্ণ নিবৃত্ত না হইলে এবং চৈতন্যের ধারা ভগবানের দিকে উন্মুখ না হইলে শুধু বাহ্য জগতের জ্ঞান নিবৃত্ত হইলেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হয় না। কখনও কখনও এমন হয় যে সুষুপ্তির গাঢ়তা ভাঙ্গিয়া যায় অথচ জাগ্রৎ অবস্থার উদয় হয় না। এই প্রকার সন্ধিক্ষণে চৈতন্য নিরালম্ব ভাবে অল্পক্ষণের জন্য আত্মপ্রকাশ করে। এইটি বোধের অবস্থা—জড়ত্ব নহে। কিন্তু কিসের বোধ? বিশ্বের নহে। এই ব্যাপক অভাবের বোধটি তখন জাগিয়া উঠে। ইহাকেই মহাশূন্যাবস্থা বলে। ইহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব সূচনা। চৈতন্য জগতের ইন্দ্রজাল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া অহঙ্কারে নিহিত অনন্ত জ্ঞানকে প্রকাশিত করিলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের প্রকাশ-কাল বলা যাইতে পারে। একমাত্র সিদ্ধ পুরুষেই এই প্রকার অনন্ত জ্ঞানের বিকাশ সম্ভবপর। সিদ্ধ পুরুষে পরমাত্মা নিজেকে অনন্ত বলিয়া জানেন, কিন্তু এই জ্ঞান সাধকাত্মাতে অথবা অসাধক অবস্থায় বদ্ধ আত্মাতে যে পরমাত্মা আছেন তাহাতে থাকে না। এইজন্যই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ব্যক্তিগত ব্যাপার। একই পরমাত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও এক আধারে তাঁহার অনন্ত স্বরূপ-জ্ঞান খুলিয়া যায়,

কিন্তু অন্য আধারে যায় না। যদি তাহা যাইত তাহা হইলে একজনের ভগবত্তা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জগতের বিচিত্র লীলার অবসান হইয়া যাইত। অবশ্য যে কোন আত্মা সাধন বলে যথাসময়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ তাহাতে কোন বাধা নাই। অহঙ্কারের গ্রন্থি এবং জগতের ইন্দ্রজাল হইতে যে আত্মা মুক্তি-লাভ করে তাহারই পক্ষে পরমাত্মভাবের স্ফূর্ত্তি সম্ভবপর, সকলের পক্ষে নহে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের ফলে আত্মা কিছু প্রাপ্ত হয় কি? এই প্রশ্নের সমাধানের পূর্ব্বে প্রাপ্তি শব্দের অর্থ কি তাহা বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। অপ্রাপ্ত বস্তুও মোহ বশতঃ অপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতীত হইলে মোহ-নিবৃত্তি দ্বারা নিত্য-প্রাপ্ত অবস্থার পুনরভিব্যক্তিকেও প্রাপ্তি বলে।

আত্ম-প্রাপ্তি বা ভগবৎ-প্রাপ্তি এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্গত। ইহা অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নহে, তথাপি ইহার মহত্ব অপরিসীম। অসিদ্ধ পুরুষ নিজেকে সীমাবদ্ধ মনে করে ও সুখ দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহার আনন্দ ও জ্ঞানের অন্ত নাই।

ভাগবত জ্ঞানের প্রাপ্তি নানা উপায়ে হইতে পারে। প্রেমই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। বিচার-মূলক জ্ঞান অন্য প্রকার। প্রেমের দ্বারাই বুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে পারা যায় ও পূর্ণ আত্মবিলোপ সংঘটিত হয়। ইহার পর ভগবানের সঙ্গে মিলন হয়। দিব্য প্রেমের প্রেমিক নিজের ব্যক্তিগত সত্তা ভুলিয়া যায় এবং ক্রমশঃ মানবীয় সীমার গণ্ডী অতিক্রম করে। ক্রমবিকাশের ফলে নিজের পরম সত্তা অভিব্যক্ত হয়। যখন মায়া ও দ্বৈতপ্রপঞ্চ হইতে আত্মা মুক্ত হয়, তখন সে একীভাব প্রাপ্ত হয়। তাই ঐ সময় মূল অদ্বয় সত্তার আকর্ষণ তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে। এই পথে প্রেমের প্রেরণাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই পথের তিনটি অংশ বা বিভাগ আছে। প্রথম অংশে পর পর অনেকগুলি স্তর আছে। এইগুলিকে ভূমি বলা যাইতে পারে। দিব্য জ্ঞানের সূত্রপাত হইতে পূর্ণ আত্মবিলোপ পর্য্যন্ত এই অংশটি বিস্তৃত। এই পথের চরমাবস্থাতে অহঙ্কার-নাশ সিদ্ধ হয় ও মায়িক ধারা হইতে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। পরে বিচ্ছেদের সংস্কার পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। সুফী সাধক-গণ এই স্থিতিকে 'ফনা' বলিয়া বর্ণনা করেন। এই দীর্ঘ পথের যে যাত্রী তাহার সম্বল কি? শুদ্ধ আত্মা ও তাহার আনুষঙ্গিক চেতনা সংস্কার, অহঙ্কার ও মন। এই অহঙ্কার শুদ্ধ আত্মারই বিকৃত রূপ—মিথ্যা রূপ। ইহার পূর্ণ লোপই স্থিতির লক্ষ্য। অহঙ্কার-নিবৃত্তির সঙ্গে কর্ম্ম, বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি সব লুপ্ত হয়। এগুলি অহঙ্কারে জড়িত হইয়া মনোময় কোষে অবস্থান করে। তখন একমাত্র চেতনা অবশিষ্ট থাকে—তাহার লোপ হয় না। সব গুণকর্ম্মাদির অভাব হয়, জ্ঞানেরও অভাব হয়। কিন্তু এই অভাবের চেতনা বা বোধটা থাকে। ইহা শূন্যের বোধ মাত্র। অহঙ্কার থাকে না বলিয়া "আমি অকিঞ্চন" এই প্রকার ভাবও থাকে না। তখন ভগবান্ নাই, বিশ্ব নাই, স্রষ্টা নাই, সৃষ্টি নাই, কিছু নাই - অথচ চেতনা আছে। ইহা অচেতন চেতনা। ইহা বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করা কঠিন। এই চেতনা স্থূল, সূক্ষ্ম, মিথ্যা, সত্য, জগৎ বা ভগবানের বিষয়ে নহে—অথচ চেতনা আছে। ইহা উপরাগ-রহিত চেতনা। সংস্কার, অহঙ্কার, মন প্রভৃতি লুপ্ত হওয়ার পরও চেতনা থাকে বলিয়া তখন প্রকৃত আমির

দিকে লক্ষ্য যায়। বিকৃত অহং নাই, তাই শুদ্ধ অহং ভাসে।

সাধারণ মানব-চেতনাতে সংস্কার বশতঃ এই প্রকৃত আমি ধরা পড়ে না। ঐ চেতনা ভ্রান্ত। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মাও অন্তশ্চেতন ছিলেন। সিদ্ধগণ বলেন যে তিনি পরমাত্মা বলিয়া নিজেকে চিনিতেন না। তাই বলা চলে যে তাঁহার "প্রকৃত আমি" ছিল না। আপাততঃ বিরুদ্ধ মনে হইলেও ইহা সত্য কথা। মিথ্যাজ্ঞানের উপরই সত্যজ্ঞান নির্ভর করে। সংস্কার-জন্য মিথ্যাজ্ঞান মূলক মিথ্যা অহং এর উপরেই প্রকৃত আমি নির্ভর করে।

পথের প্রথম অংশের চরম লক্ষ্য যে শূন্য অবস্থা তাহার কথা বলা হইল। এবার দ্বিতীয় অংশের কথা বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত চেতনা ক্রমশঃ প্রকৃত আমিকে প্রাপ্ত হইবে। ইহার ইতিহাসই দ্বিতীয় অংশের বিষয়। এই সময়ে ঐ অচেতন চেতনা রূপান্তরিত হইয়া "আমি চেতনা" এইরূপ ধারণ করে। এই বোধই পরমাত্মার বোধ যাহা "আমি পরমাত্মা" বা "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় অংশের অবসানে এই উপলব্ধি জন্মে। পূর্ব্বোক্ত সুফীগণের পরিভাষাতে ইহাই 'বকা'। ইহাই প্রকৃত ভগবত্তার বোধ।

কিন্তু ইহাও সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা নহে। সিদ্ধ পুরুষের স্থিতি যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" স্থিতি বা ব্রাহ্মী-স্থিতি হইতে উৎকৃষ্ট তাহা বলা হইতেছে না। তবে উভয়ে ক্রিয়াগত পার্থক্য আছে বলিতেই হইবে। বস্তুতঃ "আমি ব্রহ্ম" এই দশা হইতে উচ্চতর অবস্থা হইতেই পারে না। চরম অতিচেতনা অবস্থা হইতে অধিকতর উৎকর্ষ কল্পনীয় নহে। ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের অপ্রাপ্ত বা অসিদ্ধ কিছুই থাকে না, ইহা সত্য। মন, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ, দেশ, কাল, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, লোক-লোকান্তর কিছুই তখন থাকে না। ইহা চিন্তা ও কল্পনার অতীত, নিত্য, স্থির, ত্রিপুটীরহিত বিশুদ্ধ অদ্বয় স্থিতি। তখন একই থাকে —দ্বন্দ্বের ক্রিয়া থাকে না। সকল সাধনার ইহাই চরম সিদ্ধির অবস্থা।

সিদ্ধিলাভের পর কেহ কেহ দেহ থাকা সত্ত্বেও অগ্রসর হন না। স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাতে ইহারা পূর্ণতার প্রতীক স্বরূপ। ইহাদের সত্তা অনন্ত ও অসীম জ্ঞানময়।

কিন্তু পথের আরও একটি অংশ আছে—উহাকে তৃতীয় অংশ বলা হইয়াছে। উহা সকলের জন্য নহে। উহা সদ্ গুরুর বিশ্বোদ্ধার কার্য্যে যাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে তাঁহাদের জন্য। পথের তৃতীয় অংশে সূক্ষ্ম ও স্থূল চেতনার পুনরুদ্ধার ঘটিয়া থাকে। কারণ তাহা না হইলে সাধারণ জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না ও শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-বিস্তার রূপ জগদ্-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না। আধিকারিক পুরুষগণের জন্য পথের এই তৃতীয় অংশ উদ্দিষ্ট। আগমে নির্ব্বাণ-দীক্ষার পরে আচার্য্য-দীক্ষার সম্ভাব্যতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সিদ্ধ পুরুষের অতি-চেতনা ত অক্ষুণ্ণই থাকে, অথচ সৃষ্টিবিষয়ক চেতনারও অভিব্যক্তি থাকে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ 'মজুব' ও সদ্-গুরু-ভাবাপন্ন অর্থাৎ 'কুতুব' সংজ্ঞক পুরুষে স্থিতিগত কোন পার্থক্য নাই—অথচ ভাবগত পার্থক্য আছে। ব্রহ্মনিষ্ঠের দৃষ্টিতে সৃষ্টি নাই, কিন্তু অনুগ্রাহক গুরুর দৃষ্টিতে সৃষ্টি আছে, তবে উহা ব্যক্তিগত, অহং এর শুদ্ধ কল্পনাপ্রসূত। এই গুরুই নররূপী বিরূপাক্ষ ( God-man )।

---

# সান্ত্বনা

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

( ১ )

জননী আমার।
ক্লান্ত মোর দেহ মন টানি লয়ে সারাক্ষণ
কোথা যাব আর ?
জাগায়ে নবীন পাতা, গিয়াছে বসন্ত বায়ু
আজ বহুদিন ;
নিদাঘের হুতাশন দগ্ধ করি' দিগন্তর
অস্তাচলে লীন ;
সুদূর পশ্চিম পারে টানে তন্দ্রালসা ছায়া
কালো যবনিকা,—
অসীম অনন্ত শূন্যে জ্বলি' ওঠে একে একে
তারকার শিখা।
এ পারের ক্লান্ত স্বর খুঁজিছে আশ্রয় নীড়,
রুদ্ধ গৃহ-দ্বার।
ক্লান্ত মোর দেহ মন টানি লয়ে সারাক্ষণ
কোথা যাব আর ?

( ২ )

বিশ্ব জোড়া এ আঁধারে, হেরেছি তোমার দ্বারে
জ্বলিতে আলোক।
তব দ্বার প্রান্তে তাই আমারে এনেছে টানি
পথ-চাওয়া চোখ।
আজ তুমি এত কাছে, কত যে বলার ছিল,
কোথায় মিলালো!
লংঘিলাম মরুপথ, দুরন্ত পারাবার,
সবই বৃথা হ'লো!
অনন্ত জীবন ভরা মুখর বেদনা-রাশি
স্তম্ভিত নীরব,—
যে নেশায় যে আবেশে কেটে গেছে দিনমান
মুছে গেছে সব ;
রাত্রি মোর মোর দিন, যাহা গেল শান্তিহীন
গেল চিরতরে,—
অপমানে অবজ্ঞায় বিদায় দিও না তারে,
নিও স্নেহ ভরে!
অশ্রু ছল ছল চোখে তারা যে খুঁজিয়া ফেরে
তোমার-ই আলোক,
বিশ্বজোড়া অন্ধকারে তারাও তোমার দ্বারে
হেরেছে আলোক।

( ৩ )

আজিকে রয়েছে জেগে চেয়ে তব মুখে মোর
নিরালা নয়ন,
আর তুমি আছ মেলি প্রসাদ-প্রসন্ন দৃষ্টি
হৃদয় মোহন !
ললাটে ফুটেছে শান্তি, কোমল করুণা ভরা
বিকচ সুষমা,—
দুই করে বরাভয়, হরষিত পরশন
ওগো নিরুপমা !
পরিপূর্ণ প্রেম-নদী কলস্বনে নিরবধি
চলেছে বহিয়া,—
সাধ যায় আপনারে ফেলে দিই স্রোতো-নীরে
দেই প্রবাহিয়া ।
কিন্তু শুধু জাগে ভয় পরিপূর্ণ পরিচয়
অপূর্ণ আমার,
মোর মূক ভালবাসা হৃদয়ে বেঁধেছে বাসা
তোলে নি ঝংকার ।
রাত্রিশেষ ক্ষীণ শশি- সম যদি পড়ে খসি
আমার বেদন,
তাই আজি জেগে আছে তব মুখ পানে চেয়ে
নিরালা নয়ন !

( ৪ )

কী আর কহিব বল, লুপ্ত আজি সব ভাষা,
রুদ্ধ কণ্ঠ মোর ;
কাঁপিতেছে ক্লান্ত পদ, শিথিল বিবশ তনু,
ঝরে আঁখি লোর।
বিশ্বজোড়া এ আঁধারে সকল হৃদয়, হারে !
খুঁজে পেল ঠাঁই ;—
আমি একা দ্বার প্রান্তে চেয়ে আছি অনিমেষ,
আর কেহ নাই !
কিছু নাই, নাই ভাষা, নাই স্মৃতি, নাই আশা,
কেবল মিনতি,
ফুলিছে বুকের মাঝে সংগোপনে দীর্ঘ শ্বসি'
জাগায়ে আহুতি।
বারেক চাহো গো ফিরে ভিখারী হৃদয় পানে,
এ নহে প্রার্থনা,
এ নহে চরম পাওয়া এ নহে পরম চাওয়া,
এ শুধু সান্ত্বনা।

---

# শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

## তৃতীয় খণ্ড

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

( ৪ )

### সদ্‌গুরু এবং দীক্ষা

৩রা ভাদ্র, রবিবার ১৩৪৬ সন ( ইং ২০।৮।৩৯ ) আজ সকাল বেলা যখন আশ্রমে পৌঁছিলাম তখন মা শুইয়াছিলেন। একটু পরেই উঠিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে অনেক ভক্ত আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মাকে নামঘর হইতে উঠাইয়া স্মৃতিমন্দিরের বারান্দায় লইয়া আসা হইল। কে মাকে প্রশ্ন করিবেন তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। সকলেই শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ শুনিতে উৎসুক, কিন্তু মাকে প্রশ্ন করিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। অবশেষে প্রমথবাবু বলিলেন, "মা কিছু বল।"

মা। কি বলব?

প্রমথবাবু। তোমার মনে যাহা চায়।

মা। ঐ ত গণ্ডগোল, মন-ই যে নাই। ( আমাকে ) বাবা, কি বলিব?

আমি। তোমার যাহা ইচ্ছা।

মা। ইচ্ছা টিচ্ছা যে আমার হয় না।

আমি। যাহা বলিলে আমাদের সকলের উপকার হয় এমন কিছু বল। (সকলের হাস্য)

অভয়। আজিমগঞ্জে দীক্ষা, সমাধি ইত্যাদি সম্বন্ধে তুমি যাহা তিন চারি ঘণ্টা বলিয়াছিলে তাহাই আবার বল।

মা। সেখানে যে এত কথা হইয়াছিল তাহার কারণ এই যে, সেখানে কেহ কেহ তাহাদের ব্যক্তিগত সাধনা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ওগুলি তাহাদের ব্যক্তিগত। উহাত সাধারণ উপদেশ হিসাবে বলা চলে না।

আমি। আজ দীক্ষা সম্বন্ধেই কিছু বল। দীক্ষাটা কি?

মা। তোমরা লেখাপড়া কর কেন?

আমি। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য।

মা। আমিও ত বলি যে তোমরা লেখাপড়া শিখিয়া চাকরি করিয়া যেমন পেনসন্ ভোগ কর, এ পথেও সেইরূপ পেনসন্ আছে।

আমি। রামঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যেরা কাতর ও নিরাশ হইয়া যখন ঠাকুরকে বলিতেন, "বাবা, নাম ত করিতে পারি না। উপায় কি?" তাহার উত্তরে ঠাকুর নাকি বলিয়াছেন, "নাম কি করা যায়? নাম আপনা হইতেই হয়। আপনারা কিছু না করিলেও উহা আপনা হইতেই হইতেছে। তাহা না হইলে আপনাদিগকে দিলাম কি?" ঠাকুরের এই সব কথার অর্থ কি? দীক্ষা দ্বারা গুরু কি দেন? আমাদের অনুভূতিতে কিছু আসিতেছে না, অথচ কাজ হইয়া যাইতেছে। ইহা কিরূপ?

মা। তুমি দীক্ষা বলিতে কি বোঝ?

আমি। আমি নিজে কিছু জানি না। তবে

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট এ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন যে ভগবৎশক্তির সহিত শিষ্যের জীবশক্তিকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়ার নামই দীক্ষা। যদি একবার এই ভগবৎশক্তির স্রোতের সহিত শিষ্যকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায় তবে ঐ স্রোতের টানেই শিষ্য একদিন না একদিন পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। শিষ্য যদি কোন চেষ্টা নাও করে তবুও সে স্রোতের বেগে ক্রমশঃ যে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর সে যদি সাধনভজন ইত্যাদি করে তবে স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটার মত সে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবে।

মা। এ কথাগুলি খুব সত্য, খাঁটি সত্য।

আমি। বাস্, তবে ত আমাদের নামজপাদির কোন প্রয়োজন নাই। আমরা কিছু করি আর না করি পরমপদে ত একদিন যাইয়া পৌঁছিবই।

মা। (হাসিয়া) তাড়াতাড়ি যাইবার ইচ্ছা ত তোমাদের আছে, ব্যাকুলতা ত আছে, উহার জন্যই কর্ম্ম করিতে হইবে।

খুকুনীদিদি। স্রোতে যাইতে যাইতে কোন স্থানে যাইয়া ত আবার ঠেকিয়াও থাকিতে পারেন।

আমি। না, দিদি, সে ভয় নাই। মা বলিয়াছেন যে সদ্গুরুর কৃপা পাইলে আর পতন নাই।

মা। হাঁ, সদ্গুরু যদি কৃপা করেন তবে আর পতনের ভয় কি? কেহ কেহ এ ভাবেও জীবন যাপন করিতে পারে যে, আমি সদ্গুরুর কৃপা পাইয়াছি, আমার আবার সাধনভজন কি? গুরুই আমার সব করিবেন। আমি আনন্দ করিয়া জীবন কাটাইয়া যাই। আবার কাহারও হয় ত প্রাণে ব্যাকুলতা আসে, সে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইবার জন্য নামজপাদি করে। কত রকমই ত আছে। এ কথাও ঠিক যে একবার যদি কাঠে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাই ক্রমে ক্রমে কাঠখানি পুড়িয়া ছাই করিয়া ফেলে। এ বীজ ত নষ্ট হইবার নয়। মাটিতে বীজ ফেলিলে কখন কখন গাছ অল্প সময়ে হয়, আবার কখন কখন দেরীতেও হয়। জমি তৈয়ার থাকিলে বীজ হইতে গাছ শীঘ্র হয় আবার জমি তৈয়ার না থাকিলে বিলম্ব হয়।

একটি ভক্ত। বীজ ত মাটিতে পড়িয়া পচিয়াও যাইতে পারে।

মা। হাঁ, আবার হয়ত দুই চারিটি বীজ মাটিতে পচিয়াও যায়। তাহাও বৃথা নয়। পচিয়া তাহারা সার হইয়া মাটিতেই থাকে। কিছুই বৃথা যায় না। কেহ হয়ত ছোট বেলায় সদ্গুরুর কৃপা পাইল, কিন্তু দেখা গেল যে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগিলই না। পরে বুড়া বয়সে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিল। অনেকের হয়ত এ দেহে কিছুই হইল না; কিন্তু অন্য দেহে উহা হইতে পারে। দেহত্যাগ করিলে তোমরা বল না যে আবার দেহ ধারণ করিয়া আসিতে হয়। জগৎ ত গতাগতি। এখানে কেবল যাওয়া আর আসা। কিন্তু এমনও হয় যে দেহত্যাগ হইল, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিতে হইল না। কারণ জ্ঞানাগ্নি একবার জ্বলিয়া উঠিলে নিমেষের মধ্যে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারে। তখন আর আসা যাওয়া নাই।

আমি। মা, কর্ম্ম শেষ করিতে নাকি দেহ ধারণ করিতে হয়; দেহধারণ ভিন্ন নাকি কর্ম্ম শেষ হয় না?

মা। এই দেহের শেষ হইলেও ত দেহ থাকে।

আমি। তবে কি সূক্ষ্ম দেহেও কর্ম্ম শেষ করা যায়?

মা। হঁা, অনেক কর্ম্ম আছে যাহার জন্য স্থূল দেহের প্রয়োজন হয়, তখন স্থূল দেহই লইতে হয়। আবার অনেক কর্ম্ম আছে যাহা সূক্ষ্ম দেহেই হইয়া যায়। তিনি ত সকলকেই তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছেন। সকলেই এক সময়ে না এক সময়ে পরম পদ লাভ করিবে। কারণ ইহাই জীবের সংস্কার। স্বভাবে স্থিত হওয়াই জীবের সংস্কার।

আমি। মা, সংস্কার অর্থে আমরা কর্ম্মফল বুঝি। কর্ম্ম হইতেই সংস্কারের সৃষ্টি হয়। জীবের এমন কি কর্ম্ম করিবার শক্তি আছে যাহা দ্বারা সে একেবারে পরমব্রহ্মে, পরমপদে স্থিত হইতে পারে?

মা। সেই জন্যই ত বলা হয় যে গুরু কৃপা করিয়া সেইখানে পৌছিয়ে দেন। কর্ম্ম করিয়া ইহা পাইবার উপায় নাই।

আমি। মা, তুমি যে স্বভাবে স্থিত হওয়ার কথা বলিতেছ ইহা বোধ হয় সাধনের চরম অবস্থা। কিন্তু ইহাও ত শুনা যায় যে শিবলোক, বিষ্ণুলোক বলিয়া সব লোক বা ধাম আছে এবং গুরু যে লোকের শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চার করেন, ঐ শক্তি শিষ্যকে সেই লোক পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহার উর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে না। শিষ্য সেখানেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে সকলেই যে সাধনের চরম অবস্থা, অর্থাৎ স্বভাবে স্থিতি লাভ করিবে তাহা হয় কেমন করিয়া?

মা। তুমি যাহা বলিলে তাহাও সত্য। অনেক সময় দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে জীব আবদ্ধ হইয়া পড়ে। আবার সংস্কার থাকিলে সেখানে কিছুকাল আবদ্ধ থাকিয়া আবার উর্দ্ধগতি লাভ করে। কেহ বা আবার যুগযুগান্তর এক অবস্থায় থাকিয়া যায়। কত রকমইত হয়। ইহার কি অন্ত আছে?

প্রমথ বাবু। মা, এ সব জ্ঞানের কচ্‌কচি, লোক লোকান্তর আমি বুঝি না। আমি বলিতে চাই যে তুমি মা আছ, তোমাকে পাইতে হইলে আমাদিগকে এই সব জানিতে হইবে নাকি?

মা। তুমি যে ওকালতি করিতেছ, কিছু না শিখিয়াই কি ওকালতি করিতেছ?

প্রমথ বাবু। তুমি কোন্ লেখাপড়া শিখিয়া এসব জ্ঞানলাভ করিয়াছ?

মা। এ দেহের কথা ছাড়িয়া দেও।

অভয়। তুমি এত বড় যে তোমার সহিত তুলনা চলে না।

মা। বড় বলিয়া যে এ দেহের কথা ছাড়িয়া দিতে বলিতেছি তাহা নয়। (হাসিয়া) এ দেহটাকে Go to hell করিয়া দেও। (সকলের উচ্চ হাস্য) তোমরা বল না এ একটা idiot? এ দেহটাকে idiot বলিয়া ছাড়িয়া দেও। (সকলের হাস্য)

প্রমথ বাবু। আমার কথা তাহা নয়। আমি বলিতে চাই যে আমি মাকে পাইতে চাই। মাকে পাইতে হইলে আমাকে কি এসব জ্ঞান লাভ করিয়া পাইতে হইবে, না মাকে পাইলেই এসব জ্ঞান লাভ হইবে?

মা। মাকে পাইলেই সব লাভ হইবে। সেদিন না বলিতেছিলাম যে, মা চায় তাহার সন্তানকে সব কিছু দিয়া দিতে। তাহার যা' কিছু আছে তাহা সন্তান লাভ করুক ইহাই মায়ের ইচ্ছা।

প্রমথ বাবু। এই ত বেশ কথা। ইহা বেশ বুঝি। তবে মা, হয় কি জান? ইহাদিগকে এই সব জ্ঞানের কথা আলোচনা করিতে দেখিয়া নিজের ভাবের প্রতি সন্দেহ আসে। মনে হয় এরা বুঝি সব

লুটিয়া লইয়া গেল আর আমি ঠকিলাম। (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) দেখ উদ্দেশ্য এক হইলেও পথ সব আলাদা আলাদা। কেহ বা জ্ঞানের পথ, নেতি নেতি বিচার ইত্যাদি বাছিয়া লয়। কেহ বা ভক্তি অথবা কর্ম্মের পথে চলে। কিন্তু উদ্দেশ্য এক।

প্রমথ বাবু। আমার এসব প্রশ্নাদি ভাল লাগে না।

মা। লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া একটু একটু বিদ্যা লাভ হইলেই এই সব প্রশ্ন উপস্থিত হয়। যতই জ্ঞান লাভ হয় ততই প্রশ্ন বাড়ে। আর যে বই ছোঁয় না, তাহার পড়াও নাই, প্রশ্নও নাই। আবার আর এক স্তরের লোক আছে যাহাদের কোন গোলমাল নাই; তাহাদেরও প্রশ্ন নাই।

প্রমথ বাবু। আমি বোধ হয় এই শেষোক্ত স্তরের লোক। (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) তাহাত ভাবেই বুঝা যায়। (সকলের হাস্য) তাহাদের কিন্তু ঠকিয়া গেলাম বলিয়া কোন সন্দেহ আসে না।

প্রমথ বাবু। মাকে পাইতে হইলে এ সব জ্ঞান এড়াইয়া মাকে পাওয়া যায় না?

মা। দেখ, এই যে একটু আগে বলিলাম যে স্বধন লাভ করাই জীবের স্বভাব। স্বভাবতঃই জীব সেই দিকে চলিতেছে। এই স্বাভাবিক গতিতে কিছুই এড়াইয়া চলা নাই। জলের গতি দেখ না? জল ঢালিয়া দিলে, উহা চলিতে আরম্ভ করিল। পথে যদি কোন গর্ত্ত পড়ে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ গর্ত্ত পূর্ণ না হয় ততক্ষণ জলের গতি বন্ধ থাকে। যেই পূর্ণ হইয়া গেল আবার চলিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে জীব স্বাভাবিক গতিতে শান্তত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পথে সে কিছুই পাশ কাটাইয়া যাইতেছে না; কিছুই তাহার আজানাও থাকিতেছে না। তাই বলি কর্ম্ম করিয়া যাও। কর্ম্ম করা দরকার। তবে কর্ম্ম করিলেই যে তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে এমন নয়। তাঁহার কৃপাতেই সব হয়।

**সন্দেহ কিসে যায়**

প্রমথ বাবু। আচ্ছা, মা, সন্দেহ কিসে যায়?

মা। তাঁহাকে লাভ করিলেই সন্দেহ যায়। চৈতন্যশক্তি বা গুরু প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে সন্দেহ যাইবে না।

প্রমথ বাবু। ইহা কোন উত্তর হইল না। আমি বলি যে আমরা কি কাজ করিলে আমাদের সন্দেহ চলিয়া যাইতে পারে তাহা তুমি বলিয়া দাও।

মা। গুরু হইতে যাহা লাভ করিয়াছ তাহা লইয়াই কাজ আরম্ভ কর। কাজ করিতে করিতেই তাঁহার কৃপায় সন্দেহ চলিয়া যাইবে।

অভয়। এ সব কিছু সত্য নয়। তুমি বলিলেও আমরা তাহা বিশ্বাস করিব না।

মা। আমি ত কাহাকেও আমার কথা শুনিতে বা বিশ্বাস করিতে বলি না। তোমরা এই দেহকে যাহা বলাও ইহা তাহাই বলে। এই সব কথার মধ্যে কেহ কেহ প্রয়োজন অনুসারে তাহাদের যাহা পাইবার তাহা পাইয়া যায়। আবার কেহ কিছু পায়ও না; কারণ তাহার কোন প্রয়োজন নাই। যেমন তুমি একটি জিনিষ ফেলিয়া দিলে, কেহ হয়ত উহা লক্ষ্য করিয়া চলিয়া গেল; আবার কেহ উহা প্রয়োজন-বোধে কুড়াইয়া লইল। আমার কথাও সেইরূপ।

**মন স্থির করিবার উপায়**

প্রমথ বাবু। কি করিলে আমাদের সন্দেহ যাইতে পারে সে সম্বন্ধে কিছু বল।

মা। ঐ যে বলিলাম, গুরু যাহাকে যাহা দিয়াছেন তাহা লইয়াই কাজ আরম্ভ কর। অনেক সময় জপের কথায় বলা হয় না যে, কেমন করিয়া জপ করিলে মন স্থির হয়? সকলেই ত মন স্থির করিতে চায়, কারণ মন স্থির না হইলে আনন্দ পাওয়া যায় না। মন স্থির করিবার একটা উপায় বলিতেছি—

তোমাদিগকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট ইহারা সকলেই এক। গুরুকে বা ইষ্টকে ধ্যান করা বা মন্ত্র জপ করা একই কথা। কারণ নাম আর নামী এক। তাই তোমরা গুরুর নিকট হইতে যে মন্ত্র পাইয়াছ তাহা লইয়াই জপ আরম্ভ করিবে। জপ করিবার সময় গুরু যে মূর্ত্তি তোমাদিগকে কল্পনা করিতে বলিয়াছেন সেই মূর্ত্তি বা গুরুর ফটো ইত্যাদি তোমরা ধ্যান করিবে। এই ধ্যান কোথায় করিবে? হৃদয়েই ধ্যান করা ভাল। কারণ হৃদয়ই সুখদুঃখের জায়গা কি না। তবে গুরু যদি কাহাকেও ধ্যানের কোন বিশেষ স্থান, যেমন ষটচক্রের কোন চক্র, ধ্যান করিতে বলিয়া দিয়া থাকেন, তবে তাহার কথা আলাদা। সে গুরুর নির্দ্দিষ্ট স্থানেই ধ্যান করিবে। দেহের নানা স্থানে যে ভিন্ন ভিন্ন চক্র আছে, এবং প্রত্যেক চক্রের যে বিভিন্ন রূপ বা মূর্ত্তি আছে এ কথা হয়ত তোমরা পড়িয়াছ। এ দেহের ত কোন লেখা-পড়া নাই; কিন্তু এ দেহ এ সব স্পষ্ট করিয়া দেখিয়াছে বলিয়াই এ সব কথা বলিতেছে। এ সব চক্রের বিভিন্ন মূর্ত্তির ধ্যানে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও অনুভূতি লাভ হয়। যাক্ সে কথা।

তোমরা হৃদয়ে গুরু বা ইষ্টকে বসাইয়া ধ্যান আরম্ভ করিবে। হৃদয়ে ধ্যান করিবার আরও একটি কারণ আছে। তোমরা যদি বীজ হইতে গাছ উঠাইতে চাও, তবে বীজটি মাটিতে পুতিয়া দিয়া উহাতে জল ঢালিতে থাক। তোমাদের সেবাযত্নে এবং মাটির শক্তিতে বীজ হইতে গাছ হয়। মাটির শক্তি বলিতেছি কেন? কারণ বীজ হইতে গাছ ফুটাইতে হইলে মাটির প্রয়োজন। গাছ গজাইয়া উপরে উঠিলেও গাছের শিকড় কিন্তু মাটির নীচেই থাকে, এবং এই শিকড়টাই গাছের প্রাণ। কারণ দেখা যায় যে, অনেক সময় গাছের ডালপালা ছাটিয়া ফেলিলেও গাছের শিকড় থাকে বলিয়া গাছ মরে না। ঐ গাছ বড় করিবার জন্য তোমরা জল দেও। জল কিন্তু গাছের গোড়ায় দেও, শিকড়ে আর দেও না। গাছের গোড়ায় জল দিলেই সেই জল শিকড়ে গিয়া পৌঁছে এবং উহার সাহায্যে গাছ বড় হইতে থাকে। সেইরূপ আমাদের দেহগাছটির শিকড় হইল মস্তকে, আর ডালপালাগুলি নীচের দিকে। হৃদয় হইল ঐ গাছের গোড়া এখানে জল দিলেই উহা শিকড়ে গিয়া পৌঁছায়। সেইজন্য ধ্যান হৃদয়ে করিতে হয়।

একটি ভক্ত। হৃদয় কোথায়?

মা। জগতের সর্ব্বত্রই হৃদয়। শরীরের যে কোন স্থানে, হাত বল, পা বল, সকল স্থানেই হৃদয় আছে। তবে (বুকে হাত দিয়া) হৃদয় বলিতে আমরা এই স্থান বুঝি। এইখানেই ধ্যান করিতে হয়।

ধ্যান করিতে যাইয়া তোমরা কি করিবে? গুরু বা ইষ্ট যাঁহাকে তোমরা হৃদয়ে বসাইয়াছ তাঁহার মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। কিন্তু চিন্তা করিতে গেলেও দেখা যায় যে মন সেখানে স্থির থাকে না। এক মিনিটও মনকে ঐখানে ধরিয়া রাখা যায় না। সেইজন্য আমি বলি যে গুরুকে হৃদয় আসনে বসাইয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিবে। এই শ্বাসপ্রশ্বাসই আমাদের প্রাণ। এই শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যেই

আমরা বাঁচিয়া আছি। মানুষ, পশু, পক্ষী, ইহারা নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরে ভিন্ন হইলেও এক বিষয়ে, অর্থাৎ প্রাণ হিসাবে এক। কারণ সকলেই প্রাণ দ্বারা বাঁচিয়া আছে। তাই গুরুকে হৃদয়ে বসাইয়া মনে করিতে হয় কি না যে গুরু প্রাণরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া আছেন। গুরু বিশ্বব্যাপী। তাই শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া গুরুমন্ত্র জপ করিয়া যাইতে হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া জপ সকলেই করিতে পারে। কিন্তু শ্বাসে শ্বাসে জপ গুরুর উপদেশ ভিন্ন করা উচিত নয়। পুস্তক দেখিয়া উহা করিতে গেলে মাথাগরম ইত্যাদি রোগ হইতে পারে। তবে অনেক সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিতে করিতে স্বাভাবিক ভাবেও শ্বাসে শ্বাসে জপ হইতে পারে। যাহার এরূপ হয় তাহার অবশ্য কোন ভয় নাই।

পূজাদির সময় তোমরা দেখত লোকে মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া উহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। চৈতন্যসত্তা সকল স্থানেই আছে। উহা জীবেও যেমন আছে মাটিতেও সেইরূপ আছে। কিন্তু মাটিতে যে ঐ চৈতন্যসত্তা আছে তাহা আমাদের বোধ নাই বলিয়া আমরা মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া উহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি। সেইরূপ গুরুকে হৃদয় আসনে বসাইয়া, তিনি প্রাণরূপে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছেন মনে করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিবে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া জপ করার একটা সুবিধা এই যে, মনটা উহাতে কিছু শান্ত হয়। ইষ্ট মূর্ত্তিই বল, আর ফটোই বল, উহাতে মন বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস চঞ্চল বলিয়া চঞ্চল মনকে উহার মধ্যে নিবিষ্ট করা কিছু সহজ। খুব চঞ্চল শিশুকে ঘরের মধ্যে শান্ত রাখিতে হইলে যেমন তাহার হাতে খেলনা দেওয়া হয়, ইহাও সেইরূপ।

আবার আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবে যে, জলে যে ঢেউ উঠে উহা জল বই আর কিছু নয়। কিন্তু চঞ্চলতার জন্য উহা জল হইতে আলাদা দেখায়। একই বস্তু যুগপৎ স্থির ও চঞ্চল, খণ্ড এবং অখণ্ড। ইহাই নিত্যলীলা। ইহার পরও অবস্থা আছে যেখানে জল বা তরঙ্গ কিছুই নাই। উহা অব্যক্ত অবস্থা। তোমরা যদি কিছুক্ষণ ঢেউয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাক তবে দেখিবে যে উহাতে জল ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। সেই প্রকার শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ অথবা প্রাণরূপ গুরুর উপর চঞ্চল মনকে যুক্ত রাখিয়া কিছুক্ষণ জপাদি করিলে দেখিতে পাইবে যে মন স্থির হইয়া গিয়াছে এবং সেই যে চৈতন্যসত্তা যাহা তোমার মধ্যে সর্ব্বদা আছেন তাঁহার প্রকাশ হইয়াছে। তাহার প্রকাশ হইলেই সংশয়ের শব হইল।

শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া জপ করার আরও একটা সুবিধা এই যে ইহা সর্ব্বদা সকল স্থানে করা যায়। শ্বাসপ্রশ্বাস ত চলিতেছেই, উহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিয়া গেলেই হইল। ছবি বা ফটো সম্মুখে রাখিবার প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি সকল মার্গের লোকই ইহা করিতে পারে। হৃদয়ের আসনে ইষ্ট বা গুরুকে যে বসান হইয়াছে উহা ভক্তিমার্গের সহায়ক। গুরুকে সর্ব্ব-ভূতে প্রাণরূপে কল্পনা জ্ঞানমার্গের সহায়ক জপাদি ক্রিয়া কর্ম্মমার্গের সহায়ক। তাই দেখ, জ্ঞান, কর্ম্ম ভক্তি যে মার্গের সাধকই হউক না কেন এই প্রণালীতে সাধন করিতে পারিবে।

এই সময় মাকে হাত মুখ প্রক্ষালনের জন্য লইয়া

যাওয়া হইল। আমরাও বিদায় হইয়া আসিলাম।

বিকাল বেলা আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে মাকে শিব-মন্দিরের বারান্দায় ছোট খাটে বসান হইয়াছে। সকলে মাকে দর্শন করিতেছেন। কেহ কেহ প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। দুই এক জনের সঙ্গে মা দুই একটি কথাও বলিতেছেন। একটি বৃদ্ধের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে মা বলিলেন, "বাবা, মুখে এক টুকুরা মিশ্রি রাখিও।'

বৃদ্ধ। আমার কথা কি, মা, খুব রূঢ় ?

মা। (হাসিয়া) তাহা নয়। মুখে মিশ্রি রাখিলে উহা অল্প অল্প করিয়া গলিয়া যাইবে এবং মুখে মিষ্টি আস্বাদ লাগিবে। খালি মুখে না থাকিয়া সর্ব্বদা নাম করিলে পরে রস পাইবে। তাহা না হইলে ত রিটার্ণ টিকিট করা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসা।

আবার একটি লোককে বলিতেছেন, "এখানে ত আমরা ধর্ম্মশালায় আছি। এত আমাদের বাড়ী-ঘর নয়। যদি বাড়ীঘরই হইত তবে কি কেহ আমাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ঘর ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিতে পারিত ? ডাক আসিলে ত আমরা এক মুহূর্ত্তও দেরী করিতে পারি না। কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার সুবিধাও পাই না। যেমন ভাবে থাকা তেমনি ভাবে রওনা হওয়া। তাই বলি যাহাতে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পার, যাহাতে এক ধর্ম্মশালা হইতে অন্য ধর্ম্মশালায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে না হয়, সেই চেষ্টা করিতে হয়।"

এক বৃদ্ধাকে মা বলিতেছেন, "মা, গোপালকে ঘরে লইয়া দরজা বন্ধ করিয়া থাক। তাহা হইলেই শান্তি। একটি একটি করিয়া সমস্ত দাঁতই পড়িয়া গিয়াছে। এখন বে-দন্ত হইয়াছে। গোপালকে রাখিতে না পাড়িলে আবার বে-দন্ত হইয়া আসিতে হইবে।"

একটি স্ত্রীলোক মাকে বলিতেছেন, "মা, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা আর ভাল লাগিতেছে না। বড় অশান্তি।" মা বলিতেছেন, "না, এখনও ভাল লাগিতেছে তাহা না হইলে ঘরে আছ কেমন করিয়া ? ঘরে যদি একবার আগুন লাগে তখন কি আর লোকে ঘরে থাকিতে পারে ? তখন যে সে ঘর হইতে ছুটিয়া পালায়। এখনও যে ঘরে রহিয়াছ তাহাতেই বুঝা যায় যে, ঘরে এক আধটুকু তাপ লাগিলেও এখনও ঘর ভালই লাগিতেছে।"

কমিশনারের personal assistant সাদেক খাঁ আরও দুইজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে করিয়া মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। মা যখন কক্স-বাজারে ছিলেন তখন সাদেক খাঁ সেখানে সব-ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। সেই কথা মাকে বলা হইলে মা তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, এখানে কাজকর্ম্ম করিলে যেমন পেনসন্ আছে, এই পথেও কিন্তু সেইরূপ পেনসন্ আছে। এখানে যত উপার্জ্জন কর না কেন তাহাতে অভাব কিন্তু যাইবে না। জগৎটা ত দুনিয়া, অর্থাৎ দুই নিয়া কিনা, তাই এখানে সুখদুখ, আলোঅন্ধকার, পাপপুণ্য। একটা ছাড়া আর একটা নাই। সুখের পর দুঃখ, আবার দুঃখের পর সুখ। তাই স্বভাবে স্থিত হইতে চেষ্টা করিতে হয়। স্বভাবে স্থিত হইলে পরম শান্তি।"

সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মনীন্দ্রবাবু আসিয়াছেন। তাঁহার পরিচয়ে বলা হইল যে তিনি বিবাহ করেন নাই এবং যোগাভ্যাস করিতেছেন। মা তাঁহাকে বলিলেন, "বাবাজী, তুমি বুঝি গলায়

মালা পর নাই ? তুমি কি যোগ অভ্যাস কর ?—হঠযোগ, না রাজযোগ, না অন্য কোন যোগ ?"

মনীন্দ্রবাবু। আমি হঠযোগ অভ্যাস করি না, রাজযোগ অভ্যাস করি। আগে বেশ অনেকক্ষণ করিতে পারিতাম এবং বেশ ভালই লাগিত। এখন আলস্য বশতঃ বেশী করিতে পারি না।

মা। আলস্য একটা অন্তরায়, শত্রু। আচ্ছা, এই যে যোগ করিতেছ ইহা কি তোমার স্বাভাবিক হইয়াছে ?

মনীন্দ্রবাবু। তাহা বুঝিতে পারি না। অনেক সময় মনে হয় যে ইহা আমার স্বাভাবিক হইয়াছে, আবার অনেক সময় সন্দেহ আসে যে ইহা আমার স্বাভাবিক নয়।

মা। এই যোগশিক্ষা কি কোন গুরু হইতে পাইয়াছ ?

মনীন্দ্রবাবু। চাক্ষুষ আমার কোন গুরু নাই, কিন্তু আমি জানি যে আমার গুরু আছেন।

মা হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "প্রশ্ন না করিলে ত কথা বাহির করা যায় না।"

এইরূপ কাহারও কাহারও সহিত মা দুই একটি কথা বলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর মাকে পঞ্চবটীতে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার এবং শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ তরফদার বাবা ভোলানাথ সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিন দাস গুপ্ত মহাশয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে কিছু কিছু আবৃত্তি করিলেন। ইহার পর আশ্রমের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে মার সম্মুখে আলাপাদি হইল। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় আমরা আশ্রম হইতে চলিয়া আসিলাম।

### শ্রীশ্রীমায়ের মুন্সীগঞ্জে গমন

৪ঠা ভাদ্র, সোমবার, ১৩৪৬ সন (ইং ২১।৮।৩৯)

আজ মা ঢাকা হইতে মুন্সীগঞ্জে যাইবেন। সকাল বেলা আশ্রমে গিয়া দেখিলাম ছেলেরা আশ্রমের দরজার নিকট সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে। তাহারা আজ মাকে ঢাকা হইতে যাইতে দিবে না। অতি কষ্টে আশ্রমে ঢুকিলাম। মায়ের সঙ্গে দুই একটি কথাবার্ত্তার পর মা খুকুনী দিদিকে বলিলেন, "ছেলেদিগকে উঠিয়া যাইতে বল।" খুকুনীদিদি অস্বীকৃতা হইলেন। দূর হইতে আমি শুনিতে পাইলাম মা একজনকে বলিতেছেন, "অমূল্যবাবু এবং পরেশবাবুকে (ডাঃ শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) বল তাহারা ছেলেদিগকে উঠিয়া যাইতে বলুক।" ইহা শুনিয়া আমি মাকে বলিলাম, "মা, যত গণ্ডগোলের মধ্যে তুমি আমাদিগকে ঠেলিয়া দাও। তুমি নিজে গিয়া ছেলেদিগকে উঠিতে বল না কেন ?"

মা। (হাসিয়া) তোমরা যে গণ্ডগোলের মধ্যেই আছ, তাই তোমাদিগকে গণ্ডগোলে যাইতে বলি।

পরেশবাবু শ্রীশ্রীমায়ের কথা মত ছেলেদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে এমন ভাবে যাত্রায় ব্যাঘাত জন্মাইলে একটা ভয়ানক অমঙ্গল হইবে। স্বামী অখণ্ডানন্দজীও আসিয়া কত বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু ছেলেরা তাহাদের আবদার ছাড়িতেছে না। শেষে মা আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "আমার মুখ হইতে একবার যখন বাহির হইয়াছে যে আজ যাইব, তখন যাইবই। আজ গাড়ী যদি ফেল হয় তবে কোথায় যে চলিয়া যাইব তাহার নিশ্চয়তা নাই।" ছেলেরা তখন তাহাদের অভাব অভিযোগ

নিবেদন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "মা, তুমি তিন চারি দিন এখানে রহিলে, ইহার মধ্যে তোমার সহিত কথা বলিবার আমরা একটুকুও সময় পাইলাম না। লোকে কেবল গোপন কথা বলিতে গিয়া তোমাকে আট্‌কাইয়া রাখে। আমরা আশ্রমের এত কাজ করি, কিন্তু আমরা তোমার কাছে ঘেসিতেও পারি না।" ইত্যাদি—

মা। আচ্ছা, আমি কথা দিতেছি যে আবার যখন ঢাকা আসিব তখন তোমাদের সহিত কথা বলিব।

ছেলেরা আর বেশী আপত্তি না করিয়া একে একে উঠিয়া পড়িল। মাও পরেশবাবুর মোটরে গিয়া উঠিলেন। গাড়ী ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেল। মায়ের সঙ্গে অনেকেই মুন্‌সীগঞ্জে গেলেন। আমি ধীরে ধীরে কলেজে চলিয়া আসিলাম।

### খেওড়ার পথে ঢাকা ষ্টেশনে শ্রীশ্রীমা

৬ই ভাদ্র, বুধবার ( ইং ২৩৮।৩৯ ) বেলা দশটার সময় সংবাদ পাইলাম যে মা আজ কলিকাতার মেলে ঢাকা আসিবেন এবং ভৈরবের গাড়ীতে ষ্টেশন হইতেই খেওড়া চলিয়া যাইবেন। বেলা দেড়টার সময় ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখি প্রমথবাবু, মতিবাবু, ভুপতিবাবু, রাধিকাবাবু, অবনীবাবু প্রভৃতি আসিয়াছেন। মেয়ে ভক্তদের মধ্যে অধিকাংশই আসিয়াছেন। ষ্টেশনে ভক্তদের বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার ডাঃ পন্থের কথা মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন, "মাকে যদি জনপ্রাণিশূন্য কোন এক মরুভূমিতে ফেলিয়া রাখা যায়, সেখানেও মা লোকদিগকে আকর্ষণ করিয়া এক ভিড় জমাইয়া তুলিবেন। এমনি তাঁহার আকর্ষণীশক্তি!"

বেলা প্রায় আড়াইটার সময় কলিকাতার গাড়ী আসিল। মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়া মাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া আনিলেন। ষ্টেশন-প্ল্যাটফরমের পশ্চিম দিকে একটি বড় কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে মায়ের বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। সকলে মাকে ঘিরিয়া বসিলেন। এবার কাহাকেও মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে দেওয়া হইতেছে না। ইহা শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ। মুন্‌সীগঞ্জে যাইবার সময় একটি স্ত্রীলোক নাকি কাহারও বাধা না মানিয়া ছুটিয়া মায়ের চরণস্পর্শ করিতে গিয়া গাড়ীর নীচে পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। মা বলিলেন, "যে সময় এই ব্যাপার হয় তখন আমার কিছু মনে হয় নাই। পরে মুন্‌সীগঞ্জে গিয়া হঠাৎ খেয়াল হইল যে সকলকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে বারণ করিয়া দেই।" মায়ের চরণ স্পর্শ করিতে পারিলেন না দেখিয়া কেহ কেহ মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন, তবে মায়ের আদেশ জানিয়া সকলেই নিরস্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীমা সহাস্য বদনে বসিয়া আছেন। মেয়েরা নানা প্রকার মিষ্টি, ডাব, আমসত্ব ইত্যাদি আনিয়া মাকে দিয়া প্রসাদ করাইয়া ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। আশ্রমে যেমনটি হয় এখানেও তেমনটি হইতে লাগিল। মা উপস্থিত থাকিলে লোকের স্থান অস্থান বিচার থাকে না। সকলেই যেন কি এক নেশার মধ্যে নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কার্য্য করিয়া যায়। ছোট ছোট মেয়েরা ভজন-গান আরম্ভ করিল। চারিদিকে লোকারণ্য, কিন্তু সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। লজ্জাসরমের বালাই নাই, কারণ মাকে যে গান শুনাইতে হইবে।

তত্ত্বোপদেশ যে কিছু কিছু না হইল তাহা নহে। ভক্তদের মধ্যে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা

মায়ের কথামৃত পান করিতে উৎসুক। মা ত কাহাকেও নিরাশ করেন না। তাই উপদেশও চলিতে লাগিল। বৃদ্ধদিগকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিতে লাগিলেন, "পথ ত লম্বা, সময়ও অল্প, আলস্যশূন্য হইয়া চলিতে থাক। যাহাতে আধ্যাত্মিক জগতে পেন্‌সনের ব্যবস্থা হয় তাহার চেষ্টা কর। সাংসারিক ভাবে কাজকর্ম্ম করিয়া তোমরা পেনসন্ ভোগ করিতেছ, ধর্ম্ম-জগতের জন্যও পেন্‌সনের ব্যবস্থা কর। তাহা না হইলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইবে। কাজকর্ম্ম করিলে এই জীবনেই পেন্‌সনের ব্যবস্থা হইতে পারে। অন্ততঃ যাহাতে বেশী ঘুরিতে না হয় তাহারও ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু কাজকর্ম্ম না করিলে শুধু রিটার্ণ টিকিট করা। এমনি ত তোমরা কতখানা রিটার্ণ টিকিট করিয়া বসিয়া আছ—ক-ত-খা-না।"

মনোমোহনবাবু। সাংসারিক বিষয়ে কি ভাবে পেন্‌সনের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা আমরা জানি। আধ্যাত্মিক বিষয়ে কি করিয়া পেন্‌সনের ব্যবস্থা করিব তাহা বলিয়া দিন।

মা। গুরুর নিকট হইতে যাহা পাইয়াছ তাহা লইয়া কাজ করিলেই এ পেন্‌সনের ব্যবস্থা হইবে।

একটি বৃদ্ধ। তোমার সঙ্গে থাকিতে চাহিয়াছিলাম, তুমি থাকিতে দিলে কই?

মা। আমি থাকিতে বলিলেই কি থাকিতে পারিতে? তখন ছেলে, মেয়ে, নাতির জন্য কত দুর্ভাবনা হইত। (সকলের হাস্য) তোমার পক্ষে বাড়ীতে থাকিয়াই কাজ করা ভাল। ছেলেমেয়েরা যদি সংসার হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে চায় তখন কি তাহাদিগকে বলিবে না যে তোমার সেবা না করিয়া তাহারা ধর্ম্ম করিতে গেলে তাহাদের ধর্ম্ম হইবে না? তাহারাও ত বলিতে পারে যে তাহাদিগকে যখন সংসারে আনিয়াছ তখন তাহাদিগকেই বা ফেলিয়া যাইবে কেন? (সকলের হাস্য)

বৃদ্ধ। এখন কি করিব বল।

মা। বাড়ীতে কপাট বন্ধ করিয়া থাক। তাহা হইলে বাড়ীতে থাকিয়াও না থাকার মত হইবে। ছেলেপেলেরা ত দেখিবে যে তুমি বাড়ীতেই আছ।

বৃদ্ধ। সংসারে থাকিয়া কি ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া থাকা যায়?

মা। ধর্ম্মশালায় থাকিতে পারিবে?

বৃদ্ধ। না।

মা। বাড়ীটা ধর্ম্মশালা করিতে পারিবে? আমি বলি বাড়ীটা ধর্ম্মশালা করিয়া লও।

বৃদ্ধ। যাহা পারিব না তাহা বলিয়া লাভ কি?

মা। বাড়ীটা ধর্ম্মশালা করিতে পারিবে না? ওটা ধর্ম্মশালা ছাড়া আর কিছু নাকি? মনে করিতেছ আমার বাড়ী, আমার ছেলে, আমার মেয়ে; কিন্তু শ্বাসের ঘর যখন ছাড়িবে তখন সবই পড়িয়া থাকিবে। তখন কোথায় বা বাড়ী, আর কে বা ছেলে, কে বা মেয়ে। তাই সকলকে মনে করিতে হয় যে আমরা ধর্ম্মশালায়ই আছি। আমাদের আসল বাড়ী এখানে নয়। ছেলে মেয়ে এরা কেহ আমার নয়। আমিও এদের নই। এই সব চিন্তা করিতে কেমন লাগে?

বৃদ্ধ। এসব ভাবিলে আর সংসার হয় না।

মা। তুমি একটু আলগা হইয়া দেখ না যে সংসার চলে কিনা। যাঁহার সংসার তিনিই চালাইবেন। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে তিনি চালাইয়া নেন।

আর সংসার করিবার উদ্দেশ্যে ত এখানে আসা

নয়। সংসার করিতে করিতে ত এই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ—কাল চুল সাদা হইয়াছে, মুখের যে ক'টি খুটি (অর্থাৎ দাঁত) ছিল তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। সংকে সার করিয়া আর কত কাল থাকিবে ?

দেখ, চিরকাল দরিদ্র হইয়া থাকা ভাল নয়। আমরা ত অভাবেই আছি। একটা অভাব দূর করিতে না করিতে আর একটা অভাব আসিয়া পড়িতেছে। একখানা বাড়ী করিলে আবার আর একখানি বাড়ী করিতে ইচ্ছা করে। পুরাতন মোটর গাড়ী ছাড়িয়া একখানা নূতন গাড়ী করিতে ইচ্ছা করে। এইরূপ একটার পর একটা অভাব দূর করিতে জন্ম জন্মান্তর ঘুরিতেছি। এ অভাব শেষ হওয়া ভাল। তাই বলি চিরদিন দরিদ্র থাকা অভাবের স্বভাবে থাকা ভাল নয়। ইহার চেয়ে প্রাণের সাধন কর।

বৃদ্ধ। প্রাণ অর্থ ত শ্বাসপ্রশ্বাস।

মা। হঁা, এ কথা সে দিনও হইয়াছে। প্রাণ-রূপে তিনি সর্ব্বভূতে আছেন। তিনি প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ। সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গ কর। সর্ব্বদা শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিয়া যাও। ইহাতে সব পাইবে। সৃষ্টি স্থিতি লয়, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি—সবই ইহার মধ্যে আছে। রূপ রস গন্ধ, জীব জগৎ দেবতা, সগুণ নির্গুণ—সমস্তই ইহার মধ্যে। প্রাণরূপে, তরঙ্গরূপে জগতের প্রকাশ। ইহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতির ঊর্দ্ধে যাইতে হয়। যেমন তরঙ্গকে ধরিলে তরঙ্গ-শূন্য জলকেও যুগপৎ পাওয়া যায়, সেইরূপ প্রাণের সাধন করিয়াও মহাপ্রাণের খোঁজ পাওয়া যায়। সকল অবস্থায়ই এই প্রাণের সাধন চলিতে পারে। প্রাণরূপে ভগবান্ প্রত্যক্ষ। প্রাণায়াম ছাড়া কিছুই যে হইবার উপায় নাই। ঘরে যে কপাট দিয়া থাকিবার কথা বলিলাম ইহাও তাহাই। ভোগের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে উঠাইয়া আনাই হইল ঘরে কপাট দেওয়া। তাহা না হইলে শুধু দরজা বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে কি হইবে ? (হাসিয়া) আমি বলি পঞ্চ ব্যঞ্জন দিয়া তোমরা খাও, তাহা হইলেই বেশী খাইতে পারিবে।

প্রমথ বাবু। মা, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও।

মা। পঞ্চ ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়া কি ? জপ, ধ্যান, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি একটার পর একটা লইয়া থাকিলেই এদিকে বেশী সময় দিতে পারিবে। জপ বেশীক্ষণ করিতে পারিলে না তখন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করিলে বা সৎসঙ্গ করিলে। ইহাই পঞ্চ ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়া।

বৃদ্ধ। এ বড় শক্ত।

মা। তোমরা কাজ করিতে চাও, না কেবল বসিয়া বসিয়া খাইতে চাও। ইহা কি হয় ? কাজ করিবে না আবার পেনসন্ ভোগ করিবে তাহা কি সম্ভব ?

প্রমথ বাবু। কেন, মা কি ছেলেপেলেকে পাক করিয়া খাওয়ায় না ?

মা। কতক্ষণ খাওয়ায় ? যতক্ষণ না তাহারা বলিতে পারে যে তাহাদিগকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে হইবে। তোমরা শিশুর মত একান্ত নির্ভরশীল হও দেখিবে তিনি তোমাদের সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ছেলেপেলে বড় হইয়া যদি মাকে বলে, "মা, তুমি আমাদিগকে পাক করিয়া খাওয়াও", মা হয়ত তখন তাহাদিগকে বলিবেন, "আমি খাওয়াইব কেন ? তোরাই রাঁধিয়া খা" অথবা, "তোদের বৌ আসিয়া রাঁধিয়া দিবে।" (সকলের উচ্চ হাস্য)

ট্রেনের সময় হইয়া আসিল। শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ বন্ধ হইয়া গেল। এই সময় ভূপতি (মিত্র) বাবু ঢাকার আশ্রম সম্বন্ধে দুই একটি কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাকে বলিতে শুনিলাম, "এ সব বিষয়ে আমার বলিবার কিছু নাই। তোমরা পাঁচ জনে যাহা ভাল মনে কর তাহাই করিবে। আশ্রম যদি আমার হইত তবে আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতাম। কিন্তু আমার বলিতে যে কিছুই নাই। যে স্থানে আশ্রম করা হইয়াছে উহাও আমি নির্দ্দেশ করিয়া দেই নাই। তবে আশ্রম হইবার পূর্ব্বে আমি মাঝে মাঝে এই স্থানে আসিতাম। ইহা দেখিয়া জ্যোতিষ মনে করিল আমার বুঝি এই স্থানে আশ্রম করার ইচ্ছা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আশ্রমে এক কালে যাঁহারা সাধন ভজন করিয়াছিলেন তাঁহারা আমাকে ঐ স্থানে নিতেন বলিয়াই আমি যাইতাম। এমন কি ঢাকা শা'বাগে যে আসিয়াছিলাম তাহাও ত আমাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। তাই বলি যে, আশ্রম সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। তোমরা যাহা ভাল বোঝ তাহাই করিও। যাঁহাদের ইচ্ছায় এই আশ্রম হইয়াছে, তাঁহারাই ইহা চালাইয়া নিতেছেন এবং নিবেন।"

কথা বলিতে বলিতে ভৈরবের গাড়ী আসিয়া পৌছিল। মাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইল। ভক্তগণের জয়ধ্বনির মধ্যে গাড়ী ঢাকা ষ্টেশন ছাড়িয়া রওনা হইল। ভক্তগণ বিরস বদনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১২ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৪৬ সন (ইং ২৯।৮।৩৯) খেওড়া গ্রামে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়। সেই উপলক্ষ্যে ঢাকা হইতে অনেক ভক্ত খেওড়া গ্রামে গিয়াছিলেন। খেওড়া হইতে সুলতানপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বিদ্যাকূট প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া ২৭শে ভাদ্র, বুধবার (ইং ১৩।৯।৩৯) শ্রীশ্রীমা মাত্র একদিনের জন্য ঢাকা আসিলেন। সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি আশ্রমে চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম যে মা টিনের ঘরে বসিয়া আছেন। খুকুনী দিদিও নিকটে বসিয়া আছেন। আমি প্রণাম করিতেই দিদি বলিলেন, "আপনি আজ প্রথম আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

### শোভা মা ও শ্রীশ্রীমা

একটু পর মা আমাকে বলিলেন, "বাবাজী, এবার কুমিল্লায় শোভামার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে আমাকে তাহার বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "মা যদি মেয়েকে লইয়া যাইতে আসিয়া থাকে তবে মেয়ে নিশ্চয়ই যাইবে।" সে তখনই তাহার কাকাকে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দিতে বলিল। তাহার কাকা কিন্তু আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে পারিল না যে আমি যাইব। কাজেই সে শোভা মায়ের ব্যস্ততা দেখিয়াও দাঁড়াইয়া রহিল এবং বলিল, "মা বলিলেই টেলিগ্রাম করিয়া দিতে পারি।" শোভা মা আমাকে বার বার বলিতে লাগিল, "মা, তুমি বল যে তুমি আমাদের বাড়ী যাইবে। অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্য যাইবে।" আমি বলিলাম, "মা, তোমার আবার বাড়ী আছে নাকি? তোমার বাড়ী কোথায়?" সে বলিল, "আমার বাড়ী সকল জায়গায়ই।" আমি বলিলাম, "তবে আর যাওয়া আসা কি? এখানে থাকাও যা', যাওয়াও তাই।" সে বলিল, "যদি একই হয় তবে যাওয়াটাই হউক না কেন?" শেষে শোভা মাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিলাম। তাহাকে বলিলাম যে আমাদের চাটগাঁ

যাওয়া পূর্ব্বেই ঠিক হইয়াছে। কাজেই এখন মাতাজীর বাড়ী গেলে আর সে দিন চাটগাঁ যাওয়া হইবে না।"

আমি। যাঁহারা পূর্ণ জ্ঞানী তাঁহাদের কি কামনা থাকিতে পারে?

মা চুপ করিয়া রহিলেন। খুকুনী দিদি মাকে বলিলেন, "তুমি শোভা মাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু না বলিয়া সাধারণ ভাবেই এই প্রশ্নের উত্তর দাও না?

মা। ব্যবহারিক ভাবে জ্ঞানীরা এই সব দেখাইতে পারেন। বাস্তবিক তাঁহাদের বাসনা নাই, কিন্তু সাধারণ লোক দেখিতেছে যে তাঁহারা অজ্ঞানীর মতই ব্যবহার করিতেছেন।

**তত্ত্বজ্ঞান, সমাধি**

আমি। প্রকৃত বাসনা থাকা এবং বাসনার ভাণ করা অবশ্য এক জিনিষ নয়। তোমার কথা শুনিয়া প্রথমতঃ আমার ভুল ধারণাই হইয়াছিল। আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছি—শোভা মাকে কোন তত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর দেন যাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

মা। কোন একটা বিষয় আলোচনা করিতে কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়াই করা ভাল এবং আমি যাহা বলিতেছি তাহাও কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে বলিতেছি না। এ কথা তোমরা বিশেষ ভাবে মনে রাখিও।

এই যে তত্ত্ববিষয়ের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কথা বলিলে ইহা কেমন হয় জান? তোমরা জাগতিক ভাবেও দেখিতে পাও যে, কেহ যদি কোন একটা বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করে তবে সে ঐ জাতীয় অন্যান্য বিষয়েরও অনেক কথা বলিতে পারে। কোন একটা জ্ঞানের ধারার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইলে সে অন্যান্য জ্ঞানের ধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কথা বলিতে পারে। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে।

জ্ঞানের প্রকাশ তিন প্রকারের হইতে পারে, যেমন শাস্ত্র পড়িয়া এক প্রকার জ্ঞান হয়। আবার শাস্ত্র-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু অনুভূতি থাকিতে পারে। অনুভূতির দিকে যতই একজন অগ্রসর হইবে ততই তাহার শাস্ত্রজ্ঞান নানা ভাবে বদলাইতে আরম্ভ করিবে। এইরূপ পরিবর্ত্তন যে কত প্রকার হইতে পারে তাহার সীমাসংখ্যা নাই। আবার এক রকম জ্ঞানের প্রকাশ আছে যাহা শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদির কোনই অপেক্ষা রাখে না। উহা স্বয়ং প্রকাশ। যেমন পাকা ফল হইতে রস আপনিই গড়াইয়া পরে, এ জ্ঞানের প্রকাশও সেইরূপ। এই যে তিন প্রকার জ্ঞানের-প্রকাশ বলিলাম এগুলির মধ্যেও ভাব ও ব্যবহারের পার্থক্য আছে। যাহার ভিতর দিয়া জ্ঞানের প্রকাশ হইতেছে তাহার ভাব ও ব্যবহার দেখিয়া বুঝা যায় যে তাহার জ্ঞানের মূল শাস্ত্র না অনুভূতি।

সমাধি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তোমরা অনেক সময় বল না যে অমুকের সমাধি হয়। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে ঐ সমাধির লক্ষণ কি? কেবল শরীরের লক্ষণ দেখিয়াই সমাধি বুঝা যায় না। কেহ হয়ত হাত মুঠ করিয়া আছে এবং ঐ মুঠ চেষ্টা করিয়াও খোলা যায় না। কাহারও বা একখানা হাতের উপর আর একখানা হাত আড়াআড়ি ভাবে পড়িয়া আছে। কাহারও বা পা ঐ ভাবে আছে। কাহারও হয়ত হাত পা লম্বা ভাবে পড়িয়া আছে। কিন্তু কেবল এই সব লক্ষণ দেখিয়াই সমাধি বলা যায় না।

আমি। মা, নবদ্বীপে তুমি আমাদিগকে বুঝাইয়া

ছিলে যে ভাবের প্রেরণায় কেহ যদি হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে তবে উহা সমাধি নয়। কোন একটা ভাবকে জোর করিয়া আক্‌ড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেই উহা হয়। ঐখানে কামনা বাসনা থাকে বলিয়া উহাকে সমাধি বলা যায় না।

মা। হঁ্যা, তবে ঐ ভাবকেও তোমরা ছোট মনে করিও না। বাহ্য জগতের সমস্ত চিন্তা গুটাইয়া আনিয়া কেবল একটি মাত্র ভাবকে ঐরূপে ধরিয়া থাকাও কম কথা নয়। ঐ ভাবে থাকিতে থাকিতেই সে ক্রমে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তোমরা ভাঁপে জিনিষ সিদ্ধ করিতে দেখিয়াছ ত? ইহাও সেইরূপ। কোন জিনিষ ভাঁপে সিদ্ধ করিতে যাইয় যদি দেখা যায় যে তাপগুলি নানা দিকে ছড়াইয়া যাইতেছে না তবে আমরা বুঝিতে পারি যে ঐ জিনিষ আপনা হইতেই সিদ্ধ হইবে এবং যতই সিদ্ধ হইতে থাকিবে ততই উহার বাহিরের রং ধীরে ধীরে বদলাইতে থাকিবে। সেইরূপ সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া যদি কেহ একটা ভাব লইয়া পড়িয়া থাকে তবে দেখা যায় যে, তাহার ধীরে ধীরে ভিতর ও বাহির আমূল পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই ভাবে থাকিতে থাকিতেই সে সিদ্ধি লাভ করে।

আমি। আচ্ছা মা, সমাধি অবস্থায় বাহিরের জ্ঞান থাকে কি? তুমি এক সময় সমাধি অবস্থা বুঝাইতে যাইয়া বলিয়াছিলে যে, তুমি সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছ, তখন হয়ত প্রস্রাবের একটু বেগ হইয়াছে এমন সময় সমাধির ভাব আসিল তাহার পর আর কোন জ্ঞান নাই। এই ভাবে তিন চারি ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পরে আবার যখন সাধারণ ভাবে আসিলে তখন আবার সেই প্রস্রাবের বেগ বুঝিলে এবং সমাধির পূর্ব্বে যতটুকু ছিল এখনও ততটুকু বেগ; একটু বেশীও নয়, কমও নয়। কিন্তু ঐ যে তিন চারি ঘণ্টা সমাধি অবস্থায় কাটিয়া গেল তখন জগতের কি কোন জ্ঞান ছিল?

মা। ঐ যে প্রস্রাবের বেগের কথা বলিলে, দেহের যে অবস্থা হইতে প্রস্রাবের বেগ হয় সমাধি অবস্থায় দেহের সে অবস্থা থাকে না। সব ছড়াইয়া গিয়া যেন একাকার হইয়া যায়। আবার ধীরে ধীরে স্থির হইয়া পূর্ব্বের অবস্থায় আসিতে থাকে। এইরূপ কতবার হয় কতবার যায়। তোমরা হয়ত দেখিলে যে আমি পায়খানায় গেলাম। সেখানে গিয়া ঐ ভাব আসিল তখন আর বাহ্যের কথা মনেই নাই। ভাবটা একটু কাটিয়া যাইতেই একটু বাহ্যে হইল, আবার ঐ ভাব আসাতে আবার বাহ্যে বন্ধ। কোন দিন একটু একটু করিয়া সারাদিনই প্রস্রাব করিতেছি। এগুলি কেমন জান? আগুনে দুধ জ্বাল দেওয়ার মত। আগুনে দুধ উথলাইতেছে, যেই জ্বালটা একটু টানিয়া দিলে তখন দুধের উপর পাতলা একটা সর পড়িল। আবার যেই জ্বালটা একটু ঠেলিয়া দিলে তখন সর ভাঙ্গিয়া দুধ আবার টগ্‌বগ্‌ করিতে আরম্ভ করিল।

আমি। মা, এত তুমি নিজ শরীরের ভিতরের অবস্থা বলিলে। আমি যাহা জানিতে চাই তাহা এই—মনে কর তুমি সমাধিতে পড়িয়া আছ, তোমার সমাধি ভাঙ্গে না দেখিয়া আমরা ভয় পাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা যে কাঁদিতেছি তাহা কি তুমি সমাধি অবস্থায় জানিতে পারিবে?

মা। ঐ অবস্থায় ত দুই থাকে না। সবই এক। একের মধ্যে অবশ্য সকলই আছে। খণ্ড অখণ্ড দুইই যুগপৎ আছে, যেমন জল আর জলের ঢেউ।

আমি। মা, তুমি বলিলে যে জ্ঞানের প্রকাশ

তিন প্রকার—শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্র ও অনুভূতি মিশ্রিত জ্ঞান এবং অপরোক্ষ জ্ঞান। যাঁহার এই তিন প্রকারের কোন প্রকার জ্ঞানই নাই, তিনি কি তত্ত্বালোচনা করিতে পারেন? জাতিস্মর হইলে কি শুধু পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি হইতে তত্ত্ববিষয়ে উপদেশ দেওয়া যায়?

মা। এই যে জাতিস্মর বলিতেছ ইহাও কিন্তু অনেক রকমের। প্রত্যেক জিনিষেরই অনন্ত দিক। কেহ হয়ত পূর্ব্ব জন্মের বাপ, মা, দেশ ইত্যাদির কথা বলিতে পারে। অনেক ঘটনার কথা বলিতে পারে যাহা খোঁজ করিয়া দেখা যায় যে সত্যই ঘটিয়াছে। আবার কেহ পূর্ব্ব জন্মে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিল তাহাও সঙ্গে লইয়া আসে। কেহ যদি সাধন ভজন করিয়া কোন এক লোক প্রাপ্ত হয় এবং সেই লোকের দেবদেবীর সহিত একাত্ম ভাব পায় তবে সে সেই সমস্ত ভাব লইয়াই আবার জন্ম গ্রহণ করিতে পারে এবং সেই ভাবানুযায়ী অনেক তত্ত্বকথা সামঞ্জস্য রাখিয়া বলিতে পারে। ইহা যে কত রকম হয় তাহা কত বলিব? সমস্তই যে অনন্ত।

এইরূপ কথা মা নানা ভাবে বলিতেছিলেন এমন সময় অনেক স্ত্রীলোক মাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। ছোট টিনের ঘরে লোক ধরে না দেখিয়া মাকে নাম-ঘরে লইয়া আসা হইল।

নামঘরে আসিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, কেহ কেহ তোমাকে পূর্ণ মনে করেন; কিন্তু তুমি সকল সময় সকল প্রশ্নের উত্তর কেন যে দিতে পার না তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। তোমার এরূপ হয় কেন?

মা। (হাসিয়া) দেখ, এই যে বলা হয় যে যিনি পূর্ণ তিনি সব সময় সকল কথার উত্তর দিতে কেন পারিবেন না? বাস্তবিক যিনি পূর্ণ তিনি-ত সকল কথাই প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন, ইহাতে যে যাহা মনে করে করুক। আবার এরূপও হইতে পারে যে, তিনি হয়ত কাহারও প্রাণে আঘাত দিয়া কথা বলেন না। আবার হয়ত যে যেমন অধিকারী তাহার নিকট তিনি সেইরূপ কথা বলেন। এগুলি হইল নানা দিক্ বা ভাব। কিন্তু এ দেহের ত কোন গোলমাল নাই। ইহার ভিতর দিয়া যখন যাহা হইবার তাহা হইয়া যাইতেছে। এ দেহের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাব নাই। অনেক সময় হয়ত এ দেহ হইতে সত্য কথা বাহির হইয়া যাইতেছে উহাতে লোক সন্তুষ্ট হইবে কি অসন্তুষ্ট হইবে সে দিকে লক্ষ্য নাই। আবার কখনও কখনও এ দেহ কাহারও ভাবে আঘাত দিয়া কথা বলে না। যাহা হইবার তাহা এ দেহ হইতে হইয়া যাইতেছে। এতে গোলমাল কি?

আমি। সমস্তই গোলমাল। (সকলের উচ্চ হাস্য)

মা। কেহ যদি মনে করে যে আমি উত্তর দিতে পারি না বলিয়াই অনেক সময় কথা বলি না তাহাতেই বা আমার আপত্তি কি? তোমরা আমার সম্বন্ধে যাহা বলিবে তাহার কিছুতেই আমার আপত্তি নাই।

আমি। আচ্ছা, মা, পূর্ণতার ভিতরে একটু অজ্ঞানতা থাকাই বা দোষের কি? জ্ঞান অজ্ঞান লইয়াই ত পূর্ণ?

মা। হাঁ, পূর্ণতার মধ্যে অজ্ঞানতাও থাকিতে পারে, তবে উহা কি ভাবে থাকে জান? ঐ অজ্ঞানতা পূর্ণতার অধীন হইয়া থাকে। সাধারণ জীব কিন্তু অজ্ঞানতার অধীন। যিনি পূর্ণ তিনি কিছুরই অধীন নন।

এই ভাবে অনেক কথা চলিতে লাগিল। বেলা

প্রায় ১॥ বাজিয়াছে দেখিয়া মাকে আহার করাইতে লইয়া যাওয়া হইল। আমি প্রণাম করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

বিকাল বেলা আশ্রমে বহু লোক আসিল; কিন্তু মায়ের সহিত বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হইল না। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মনীন্দ্র বাবু মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মাকে বলিলেন, "এই যে দেশে অত্যাচার অবিচার দেখিতেছি ইহার শেষ কোথায়? এ জাতি ত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। ইহাকে রক্ষা করিবার উপায় কি? আমি নিজের জন্য কিছু বলিতেছি না। এ দেশ ও জাতিটার রক্ষার উপায় কি?

মা। এ দেশের ধারাই এইরূপ। এটা দু-নিয়া কি না? এখানে সুখ দুঃখ, সত্য মিথ্যা, যুদ্ধ বিগ্রহ থাকিবেই। কখনও শান্তি আবার কখনও অশান্তি। জলের ঢেউ যেমন একবার উঠিতেছে আবার পড়িতেছে ইহাও সেইরূপ। তুমি যে বলিলে যে, তুমি নিজের জন্য কিছু বলিতেছ না ইহাও ঠিক নয়। তুমি নিজকে দেশের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছ বলিয়াই দেশের দুঃখে তোমার দুঃখ হইতেছে। কাজেই এখানে দেশের জন্য বলাও যা' নিজের জন্য বলাও তা'ই। নিজকে যদি আরও বড় করিয়া বিশ্বের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পার তখন দেখিবে যে যুদ্ধবিগ্রহগুলি কিছুই নয়। ইহা কেবল তাঁহার লীলা। তিনিই দুঃখ এবং অশান্তি সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই উহা দূর করিয়া দেন। তোমার ভিতরে যে পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুলতা জাগিয়াছে তাহাও তিনিই জাগাইয়াছেন। তিনি পরিবর্ত্তন করিবেন বলিয়াই তোমার ও আরও দশ জনের মধ্যে এই ভাব জাগাইয়াছেন। এই ভাবে সকল জিনিষ দেখিলে কিছুতেই অশান্তি বোধ করিবে না।

মা এই ভাবে অনেক কথা বলিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মা নামঘর হইতে উঠিয়া স্মৃতিমন্দিরের বারান্দায় বসিলেন এবং মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। যদিও রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত আশ্রমে ছিলাম তবুও মায়ের উপদেশ বিশেষ কিছু শুনিতে পাইলাম না।

২৮শে ভাদ্র, বৃহস্পতি বার, ১৩৪৬ সন (ইং ১৪।৯।৩৯) মা ঢাকা হইতে কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। আশ্রম হইতে মোটরে নারায়ণগঞ্জ গেলেন, কাজেই আমি আর নারায়ণগঞ্জ গেলাম না। বেলা ১২টার সময় আশ্রম হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

—ক্রমশঃ

# প্রতিবাদ

শ্রীযুক্ত

'আনন্দবার্ত্তা', সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

'আনন্দবার্ত্তা', তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যাতে শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ" প্রবন্ধের-একস্থানে ( পৃঃ ২৭৪--২৭৫ ) বলিয়াছেন —"শোভামা বলেন সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা না পাইলে কিছু হইবে না" আমার মনে হয় শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়ের এই বাক্যটিতে শ্রীশ্রীশোভামার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ পূজনীয়া শোভামাতা কখনই বলেন না যে সদ্‌গুরু না হইলে ধর্ম্মজীবনের উন্নতি একেবারেই কিছু হয় না। তাঁহার মতে সাধক যদি সরল ও ধর্ম্মপ্রাণ হয় ও পারমার্থিক কল্যাণের দিকে উন্মুখ হয় তাহা হইলে সদ্‌গুরু লাভ না হইলেও তাহার ধর্ম্মবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম একেবারেই বৃথা যায় না, কিছু ফল সে অবশ্যই পায়। কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপা থাকিলে যাহা পাইতে পারে; তাহা অবশ্যই পায় না। শ্রীশ্রীমায়ের মত এই যে, সদ্‌গুরুর আশ্রিত না হইলে পূর্ণ ব্রহ্মাবস্থা অথবা মোক্ষ লাভ করা সম্ভবপর নহে। ইতি—

শ্রীশ্রীশোভামায়ের আশ্রিতা
জনৈক শিষ্যা

---

# ĀNANDA VĀRTĀ

VOL. IV JAYANTI CELEBRATION NUMBER MAY 1956 No. 1

The ONE who is the Eternal, the Atman,
He Himself is the traveller on the path of Immortality,
He is all in all, He alone is.

## MATRI VANI

*( Replies to letters from different people at different times. )*

63.

If the body is well, all is well.*

64.

This exactly is what the world is like: life is full of worries and anxiety. Without the remembrance of God there cannot be even a prospect of peace in this world; such is its very nature. It is always the parents who have to suffer in all respects on account of their children. Like a hero you will have to remain unperturbed and persevere in patience. Appeal to God for His own sake, then only may you hope for peace.

65.

The vessels used for puja and one's own vessels should always be scrubbed by oneself. Moreover for one who lives the life of a sadhu it is only fitting so to do. The other day I met a young man who told me that when it was for the Lord's service he enjoyed doing any kind

* Every spiritual effort is based on the physical body, for only as long as man continues in the physical body it is possible for him to make real spiritual progress.

of manual labour, such as going shopping, cutting vegetables, cooking, performing the puja, cleaning the vessels and so forth. Even if someone offered to relieve him he would decline, saying that he wanted single-handed to attend to everything necessary for the service of the Lord. He delighted in carrying out all these tasks. At the same time he looked healthy and fit. In this way one keeps happy and contented, for one is working for the Lord, and it is work performed as service that purifies heart and mind. To live in this manner promotes well-being of body and mind.

Furthermore use your leisure to read religious books, to listen to discourses on spiritual subjects, or seek *Satsang* and so forth. Do not give the mind any chance of indulging in impure thoughts. The young man mentioned above had hardly enough to eat. If someone gave him a fruit he would be exceedingly pleased. Shri Gopinath Kaviraj was saying in this connection that through need and poverty one could learn what was favourable for one's *Sadhana*, such as dependence on God and so on. For those who have dedicated their lives entirely to the Supreme Quest it is good to live in this spirit; although among householders there are many who enjoy affluence and plenty. Anger, pride and the like are not helpful on the path. Reliance on God is that which is of real assistance and to feel at all times that whatever He arranges is for one's true welfare. For you yourself do not know by what means God will draw you nearer to Him.

Drink half a pint of milk a day and eat rice or roti with dal and vegetables twice daily. For so many days you have lived on a pint of milk or fresh cheese without specially benefiting by this diet. Therefore try now for a time to take normal diet and exercise, do not strain yourself unduly and see how you feel as a result.

You will have to strive earnestly to remain ever centred in God, no matter in what way He may keep you. If the mind is fixed on God the question of material wants or complaints, of honour or disgrace does not arise. The more you let your thoughts dwell on Him the more you will find yourself improving in health of body and mind. By discussions on Divine things and by a simple, frugal life you will have to prepare yourself. You must become calm and healthy. When thinking think of Him, when working let it be His service only. You are by nature good and kind-hearted, but you will have to become good in every respect. On no account allow your

thoughts to dwell on wants and complaints. Learn to adapt yourself to circumstances as they arise—then only can there be hope of peace and tranquillity.

Mataji expressed joy on hearing of your daily programme and your collective time-table, your observing silence at fixed hours, etc. She also said : "Really, it would be a matter of rejoicing if, like good boys, they could pass day and night in Divine thoughts and occupations. What is required of a pilgrim on the Supreme Path is that he should ever keep on walking. To spend one's time in the remembrance of the Eternal does indeed mean to be a traveller on this Path."

66.

In your sorrows and troubles address your prayers and petitions to Him. To Him you should confide all your difficulties, for He is the Fountain of Goodness.

---

# MATAJI'S AMARA VANI

( 17 )

*Mataji* : You want to know whether Grace* is without cause or reason ? Certainly, for Grace is by its very nature beyond cause or reason. When working one reaps the fruits of one's actions. If, for instance, you serve your father and he, being pleased with your service, gives you a present, this would be called the fruit of action. One does something and receives something in return. But the eternal relationship which by nature exists between father and son does surely not depend on any action. The Supreme Father, the Supreme Mother and the Supreme Friend — verily, God is all of these. Consequently how can there be a cause or reason for His Grace ? You are His and in whatever way He may draw you to Him, it is for the sake of revealing Himself to you. The desire to find Him that awakens in man — who has instilled it into you ? Who is it that makes you work for its fulfilment ?

This is why you should try to arrive at the understanding that everything originates from Him. Whatever power, whatever skill you possess, why, even you yourself, from where do they arise ? And do they not all have for purpose the finding of Him, the destroying of the veil of ignorance ? Everything that exists has its origin from Him alone. For all that you must try to realize yourself. Are you master even of a single breath ? To whatever small degree He makes you feel that you have freedom of action, if you understand that this freedom has to be used to aspire after the realization of Him, it will be for your good. But if you regard yourself as the doer and God as far away and owing to His apparent remoteness you work for the gratification of your desires, it is wrong action. You should look upon all things as manifestations of Him. When you recognize the existence of God as such, He will reveal Himself to you as compassionate or gracious or merciful in accordance with your attitude towards Him at the time. Just as for example to the humble He becomes the Lord of the Humble.

* *Ahetuka Kripa* — Grace without sufficient reason.

If you say : He is immutable, although action is attributed to Him by man, why call Him the 'Actor' when in reality He is free from all action ? It is because your ego sees itself as the actor that you think of Him as equally performing action.

Of course, He is whatever you take Him to be. On the other hand where THAT is, just think, who is to become the doer of what action and upon what is he to act ? Without feet He walks, without eyes He sees, without ears He hears and without mouth He eats — in whatever way you may describe Him, He is thus.

When a *sadhaka* starts worshipping an image ( *vigraha* ) representing his Beloved, he will in the course of his practice reach a state where he actually beholds the form of his Beloved in whatever he looks at. Next he comes to realize that all other deities are contained in his Beloved; that everyone's Lord — in fact everything is contained in his own *Ishta* and that He dwells in all of them, as indeed in everything. The *sadhaka* comes to feel : As my Lord resides within me, so He who resides within everyone else is truly the same Lord. In water and on land, in trees, shrubs and creepers — everywhere in the whole universe abides my Beloved. Further, all the various forms and modes of being that we behold, are they not expressions of my Beloved ? For there is none other save Him. He is smaller than the smallest and greater than the greatest.

Actuated by your various inborn tendencies you each worship a different deity. The true progress in one's spiritual experience depends on the sincerity and intensity of one's aspiration. The measure of a person's spiritual advance will be reflected in the manifestations that are vouchsafed to him of his *Ishta*, who will by no means remain inaccessible or separate from His devotee, but let Himself be contacted in an infinite variety of ways. Conditioned though you be, you will find the All within you and on the other hand be able to grasp that your own innate tendencies are also part of this All. What has been said here represents one point of view. You cannot dissociate yourself from the Whole.

The multifarious kinds of beasts, birds, men etc. — what are they all ? What are these varieties of shapes and modes of being, what is the essence within them ? What really are these everchanging forms ? Gradually, slowly,

because you are rapt in the contemplation of your Beloved He becomes revealed to you in every one of them ; not even a grain of sand is excluded. You realize that water, earth, plants, animals, birds, human beings are nothing but forms of your Beloved. Some experience it in this manner ; realization does not come to everyone in the same way. There are infinite possibilities and consequently, which for any particular person is the specific path along which the Universal will reveal itself in its boundlessness, remains concealed from the average individual.

What you have just heard in the discourse on the *Srimad Bhagavata* about the universal body of the Lord comprising all things — trees, flowers, leaves, hills, mountains, rivers, oceans and so forth — a time will come, must come, when one actually perceives this all-pervading universal form of the One.

The variety of His shapes and guises is infinite, uncountable, without end. So then, 'He who is multishaped, who constantly creates and destroys these forms of His, He is the One whom I adore.' To the degree that one grows in the ever wider and fuller recognition of this truth one will realize one's oneness with each one of these numberless forms. In this immensity there are diverse shapes, diverse modes, manifested in diverse ways, without end, without number — and yet there is end and number. When a *sadhaka* enters this state he becomes conscious of the perpetual transformation of all forms and moods and awakens to true understanding, which is the comprehension that the Supreme Himself manifests as the power of understanding. Now as to 'skill' : when the current of one's thinking that was directed towards worldly matters is reversed and turned inwards, the One Himself becomes revealed as this 'secret skill'. Look at the everchanging world, where what exists at one moment is non-existent the next, where being is continually entering into non-being — who is there in the form of this non-being ? Even the non-existent exists .

In this connexion it must be said that if you want to find Truth you will have to realize everything as it is in its own place without choosing one thing rather than another. It is a Kingdom without end, in which even what you discern as non-existence is equally an expression of the ONE. In the purely spiritual ( *chinmayi* ) world all forms, whatever they be, are ever

eternal. Therefore simultaneously and in the same place there is non-existence as well as existence and also neither non-existence nor existence.— and more of the kind ( if one can proceed further ).

Very well, the Beloved is thus comparable to ice, which is nothing but water, and consequently He is without form, without quality and the question of manifestation does not arise. This is a state of Self-realization. For to find the Beloved is to find one's Self, to discover that God is one's Self, wholly identical with Oneself, one's innermost Self, the Self of one's Self. Then according to the exigence of time and circumstances various possibilities may take effect as for example the peculiar modes of revelation of *mantras* by the ancient Rishis. In such cases *mantras* or the whole of the *Vedas* were revealed to them. All this cannot but occur in consonance with the individual Karma and the inner dispositions of the person concerned. When a *sadhaka* realizes what form and formlessness essentially are, it is indeed a consummate realization. He realizes what *Bhava* is, its connexion with the *Shabda Brahma**, numerous types of languages, language without end and also language in the form of *Shabda Brahma*.

Sounds of infinite varieties and kinds manifest themselves to him in concrete forms ; this occurs on the plane where sounds appear as visible forms, ( similar to forms known to us. ) Well, yes, form is really void ; one sees that freedom from form means that form itself is the void. In this way the world reveals itself as void before it merges into the Great Void (*Mahashunya*), because the void that is perceived within the world is a part of *Prakriti* ( nature ) and therefore still form. From this void one will have to proceed to the *Great Void*.

It is the perception of the world based upon the identification of yourself with your body and mind that has all along been the source of your bondage. A time will come when this kind of perception will give place to a knowledge founded on your oneness with the whole universe, which will reveal itself as an aspect of Supreme Knowledge. When this knowledge of the Essence of Things, when universal consciousness has awakened, what happens to the Essence Itself ? Ponder over this ! When insight into form and the formless

* The eternal sound which is the first manifestation of the Supreme Reality and lies at the root of all subsequent creation.

dawns in its boundlessness everything will be uprooted. On transcending the level where form, diversity and manifestation exist one enters into a state of formlessness. What can this be called ? Godhood, the *Paramatma* Himself. As the individual self becomes gradually freed from all fetters, which are nothing but the veil of ignorance, it realizes its oneness with the Supreme Spirit (*Paramatma*) and becomes established in its own Essential Being.

Now to another aspect of the matter. Everyone has his own path. Some advance along the line of Vedanta, but as they progress they find the path of a Rishi opening out for them. To others also whose spiritual practice, worship or yoga proceed with the help of images and other intermediary aids, the same path of a Rishi may become disclosed. Yet others, who are guided by voices and locutions from the Unseen, at first hear these voices as audible sounds, but gradually in perfect language which conveys the full significance of the thoughts and ideas it expresses. By and by it becomes evident that these voices emerge from one's own Self and that they are He Himself manifesting in that particular way. No matter what be your line of approach, in due course the path of a Rishi or a similar path may open out for you in some form or manner. But at what time this will occur and to whom is beyond the ken of the ordinary person's knowledge.

Well, now suppose a man follows his own specific path which happens to be the worship of a concrete form. When he has a vision of it,is it only of the particular deity it represents or does it not also refer to the abstract form of the Self ? It thus becomes clear that the Supreme is present as much in the abstract form of the Self as in the concrete form of the deity. Someone who by the method of Vedanta has in a natural way ( *Sahaja Bhava* ) become fully merged in the Self, will realize that as water is contained in ice so the Supreme Reality can be found in the image. He will then come to see that all images are really the spiritual forms of the ONE. For what is hidden in ice ? Water of course. Therefore when we speak of the All, the Universal, there are obscurations, veils, grades of unveiling etc. like solid and melting ice. Whereas in the pure Self there can be no question of stages. With ice, even though it may be melting, there is potentially the possibility of its existing as such again here or elsewhere in future. Consequently for Him, who Himself manifests in the form of ice, there can be no question of the eternal or the non-eternal.

Hence when one speaks of *Dvaitadvaita*, ( monism and dualism at one and the same time ), both are facts. Just as you are father, son and husband all at once. How can there be a son without a husband or a father without a son ? This shows that none of the three is less important than the others and that in this case there can be no question of higher and lower states ; there is only equality, sameness ( *sama* ). However there is a place where one can actually speak of higher and lower states. Each of the two standpoints is complete in itself. No simile can be applicable in every detail, therefore take note only of that much for which it is intended. To sum up : water and ice exist eternally. Likewise He is as indubitably with form as He is without form. When with form which can be compared to ice, He appears clad in limitless different shapes and modes of being — which are actually spiritual in nature. Depending on one's avenue of approach prominence is given to one particular form.

Through every religious sect He gives Himself to Himself and the value of each of these sects for the individual is that they each indicate a different method to Self-Knowledge. He alone is water as well as ice. What is there in ice ? Nothing but water. On the plane where *Dvaitadvaita* exists, both duality and non-duality are facts ; expressed from this position there is form as well as freedom from form. Again when saying there are both duality and non-duality, to which level of consciousness does this kind of statement correspond ? There is certainly a state where both difference and non-difference exist simultaneously — in very truth He is as much in difference as He is in non-difference. Do you not see that from the worldly point of view you quite obviously assume that there are differences ? The very fact that you are endeavouring to find your Self evinces that there must be the feeling of separateness in you, that in agreement with the manner of the world you think of yourself as apart. From this point of view difference undoubtedly exists. But then the world is heading towards destruction ( *nasha* ) inevitably, since it is not the Self ( *na sva* ), not He ( *na sha* ). It cannot last for ever. Yet who is even in this guise ? Ponder over this ! Well then, what goes and what comes ? Behold, it is movement as that of the sea ( *samudra** ), *He expressing Himself* ( *sva mudra* ). The waves are but the rising and the falling, the undulation of the water, and it is the water that forms into waves ( taranga )* — limbs of His own body ( *tar anga* ) —

---

* Here Mataji plays upon words : *samudra* = sea, *sva mudra* = His own expression ; *taranga* = wave, *tar anga* = His limbs.

water in essence. What is it that makes the same substance appear in different forms as water, ice, waves ? This again is the problem of a particular plane of consciousness. Reflect and see how much of it you can grasp ! No simile is ever valid in all respects . Yet it has helped you to view this with reference to the world. What lesson have you actually derived from it ? Find out ! What you thought of as with form you have discovered to be formless. Further that the realization of Truth cannot come through this process of speculation you will also have to understand.

The aforesaid implies that He eternally manifests displaying desire and quality; but also without form and quality; and still further it infers that there can be no question of attributes and attributelessness, since there is solely the ONE-without-a-second. You speak of the Absolute as Truth, Knowledge, Infinity. In pure *Advaita* no question of form, quality, or predication – be it affirmative or negative – can possibly arise. When you say : "He is only this" and then "He is *also* this," you have confined yourself within the limits of the word "also" and as a result assume the separateness of the thing referred to. In the ONE there can be no "also." The state of Supreme Oneness cannot be described as THAT and also as something other than THAT. In the attributeless *Brahman* there can be no such thing as quality or absence of quality, there is only the One Self and nothing but the Self.

Suppose you believe that He is with quality, embodied and you become wholly centred on this aspect of Him, then formlessness does not exist for you — this is one state ( *sthiti* ). There is another state where He appears with attributes as well as without. There is yet another state—( these states are not progressive but each complete in itself ) — where difference as well as non-difference exist, both being impenetrable, where He is quite beyond expression. Besides one can take the stand of the *Vedic Karmakhanda*. This and all that has been said above is within the Supreme State of which it is said that even though the Whole is taken from the Whole, the Whole remains the Whole. There can be no additions and no subtractions, the wholeness of the Whole remains unimpaired. Whatever line you may follow represents a particular aspect of it. Each method has its own *mantras*, its own ideas and states, its beliefs and rejections—to what purpose ? To realize Him — your own Self. Who or what is this Self ? Depending on your orientation you

find Him—which is your own Self—as a perfect servant in relation to his master, as a part in relation to the Whole or simply as the One Self (*Atma*).

Look, if one believes in God ( *Bhagavan* ) His Divine Power ( *Shakti* ) is already taken for granted. It is in this connexion that the distinction of gender appears, namely God as male and His Power as female. Yet there is no question of male or female—from one standpoint; whereas from another the Divinity is conceived as divided into male and female. The Eternal Virgin ( *Kumari* ) does not depend on anyone, She Hersealf is the ONE as Power. Where everything is perceived as Power it is Power in the form of Being ( *Satta* ) : with form or as the formless everywhere it is Power as such which constitutes His form. When idea (*bhava*) and action manifest then only can form emerge. Further if you think of *Bhagavati* Herself as the Supreme, there are untold manifestations of Her Power. Again *Maha-Shakti* (Supreme Power) which is the root-cause of everything — of Creation, Preservation, Dissolution – just as with a tree boughs and branches spring forth from its root, so all kinds and orders of deities, angels, archangels, etc. are generated as the manifestations of that Power.

The specific character of Shiva is a transcendance from all change and mutation which is symbolized by a *Shava** and denotes that in the death of death lies Immortality, namely *Shiva*. On the plane of Creation, Preservation, Dissolution He is in the form of Creation, and as what is called *Maha Vishnu* in the form of Preservation. As regards the various positions He is indeed in all of them, manifesting in diverse ways and as the formless. In each one of them all the rest are contained and in this multiformity behold the ONE. When you gaze at one form you cannot see any other, but in each one of them the All is present and all forms are of the ONE. In the void there is fulness, and in fulness the void. There are possibilities of every sort and description, but the root is the ONE, the GREAT LIGHT. Even when speaking merely of one line — how can the end of it be found ? Yet when the individual is unable to proceed any further then there seems to be an end.

What is in the form of Being ( *satta* ) ? The Self ( *Atma* ), the Supreme ( *Paramatma* ), call it what you will. That which you variously style God ( *Bhagavan* ), Divine Power ( *Bhagavat Shakti* ), the Lord of the world, Divine

---

* *Shava* ordinarily means corpse, but in the case of Shiva the transcendence of Supreme Power which has withdrawn from Shiva's body so that it remains corpselike.

Majesty, Glory, Splendour etc. is only He, the ONE. Very well, God is immutable, the non-actor ( *akarta* ) since He is free from all activity. Only one who engages in action may be described as the actor in respect to that action. Since He Himself is in the form of all causes and effects, how can one speak of Him as controlling or not controlling them ? Hence here He is not the actor. But where His *Maya* is, where the display of His Divine Power and Majesty is to be found, and where nature functions mechanically, who manifests there ? The ONE of course. The static and the dynamic, these one-sided points of view of yours belong to the veil of ignorance. You speak of Him as the Actor or Non-actor, trying to limit Him to the one or the other. These distinctions are but natural on account of the angle from which you regard them. He is whatever you take Him to be ; you see Him according to your way of thinking and as you portray Him so He is.

As long as the curtain, the veil of ignorance exists you are bound to see and hear in this restricted way; until the obscuration is removed how can you expect the revelation of Truth to occur in its totality ? When the veil is rent asunder the fact will be disclosed that all the diverse forms are none but He Himself.

Very well, the many creeds and sects serve the purpose that He may bestow Himself on Himself along various channels — each has its own beauty — and that He may be discovered expressed in countless ways in all shapes and in the formless. In the form of the Path He attracts each person to the particular line that will guide him in harmony with his inner dispositions and tendencies. The One is present in each sect, even though outwardly there appears to be abiding conflict among them, which is due to your ego-nature being full of doubt. This body however does not exclude anything. If you follow one particular creed or sect you will have to go right up to the point where all its characteristics will be known to you. When advancing along one line, in other words when adhering to one particular religion, faith or creed, which you conceive as distinct and as conflicting with all the others you will first of all have to realize the perfection to which its Founder points, and then beyond that the Universal will of itself become revealed to you.

What has just been explained is applicable in the case of each of the various sects; yet it is of course true that if one stops short at whatever can be achieved by following one line, the Goal of human life has not been reached. What is required is a realization that will uproot conflict and

divergence of opinion, that is complete and free from inherent antagonism. If it be anything less than that it means that one's inner experience is partial and incomplete. In true Realization one can have no quarrel with anyone — one is fully enlightened as to all creeds, faiths, doctrines and sects and sees all paths as equally good. This is absolute and perfect Realization. So long as there is dissension one cannot speak of attainment. Nevertheless one should undoubtedly have firm faith in one's *Ishta* and persue with constancy and single-mindedness one's chosen path.

Now as to the fruit of action : just consider, if one's action is continuous, without a break and one remains ever conscious of the Goal — who will be revealed by such action ? The Indivisible One. But even in every action as such the Perfect one stands Self-revealed — this is the true significance of each action; to strive is the distinctive characteristic of the individual. It is natural for man to perform actions which are the expression of his true being and it is natural for him to feel the urge to engage in actions of this type. Man's true nature is *Sva*, *Svayam*, *Atma*, call it by any name, He, the Supreme — I myself.

---

# SOME OF MOTHER'S WAYS

*By*
Vijayananda (Dr. Adolphe Weintrob)
( Translated from the French )

I certainly am not so presumptuous as to claim to understand Sri Ma's methods. In this short article I should merely like to give some idea of my impressions concerning this subject. These impressions must of necessity be limited and, as it is with everything personal, are not to be entirely relied upon. For to really understand Sri Ma would mean to have had the vision of the *Paramatma*; this is why one's words are like arrows that fall back having missed the target.

What has particularly struck me is Sri Ma's extraordinary mastery in dealing with human beings and their feelings. She gives me the impression of a great magician who knows thoroughly all the strings that cause the marionettes that we all are to move, and which She pulls with consummate skill.

When I use the word "magician" it is only for the sake of simplicity of expression, for Sri Ma never imposes on anyone any point of view or way of thinking. She leaves everybody absolutely free and does not give orders, only suggestions, and even what She suggests is always what is most suitable for us. If we do not accept Her advice, She does not insist, but very often proposes another solution. In our blindness She guides us where, from the very depths of our being we really want to go—towards the Great Illumination. Only under exceptional circumstances, when it is Her 'Kheyal'' She may give what seems to us a definite order and then we feel compelled to obey.

But what I wish to refer to here is not a guidance expressed in words, but one which emerges from our inner being. We ourselves choose our path, prompted by the Dweller in the human heart, the *Antaryarmin*, the *Hridaya-vasini*, of whom Sri Ma is the visible aspect which we perceive through the veil of our ignorance. Our destiny, our *Prarabdha Karma** comprises a number of possibilities, the total of

* **Prarabdha Karma** is that portion of one's past actions which is bound to fructify in the present life and cannot be averted.

which cannot be changed, yet may be utilized in various different ways. Just as for instance when several brothers inherit equal shares of their father's property, each one of them may use his heritage in his own way. The first might squander it on riotous living, the second use it parsimoniously and the third make it the basis of a huge fortune. Mataji teaches us how to manipulate wisely the share of wealth that destiny has bestowed on us, namely to transform it into *Paramdhan*, Supreme Wealth.

In order to cure us from the disease of ignorance and delusion and to direct us to our Supreme Goal, the great healer of souls whom we call Sri Anandamayi Ma employs innumerable remedies and techniques which vary according to the needs of each individual.

Perfect and lasting happiness is what all of us seek, consciously or unconsciously. Our discontent is the result of our feeling that we are incomplete, that we lack something. The happiness we hope to find in family life, friends and possessions is nothing else but Reality Itself, viewed through the distorting prism of words and emotions; we look for it in the wrong direction. (I am repeating here, possibly not quite faithfully, an idea that I have heard expressed by Sri Ma.) We chase our own shadow that can never be caught. It is by looking within that the solution of our problem is to be found. But this great pilgrimage can only start from the point at which we happen to be. Here, I feel, lies the incomparable universality of the message of Sri Anandamayi Ma. Most sages address themselves only to those who already are aspirants on the spiritual path, whereas Sri Ma can help anyone at any stage or level provided he possesses a spark of good-will. She Herself is free from ego or individuality. Divinity and Love Eternal flow from Her in great abundance. She radiates the happiness which we seek in vain in the objective world and which in fact is nothing else but our own essential being, our own true nature. Thus She is able to alter the course of our feelings and thoughts, focussing them entirely on Her own person. The psychiatrists would call this an emotional transference. But this is only the first phase of the operation She performs on us. For to limit the Divine to one form, however inspiring, however noble, is not the ultimate goal. Love for one particular form can never be real 'Love', it is *moha*, attraction through delusion, attachment. So long as the idea of duality persists there must always be a mixture of attraction and repulsion. True Love is the realization of the Oneness of all things.

Once I heard Sri Ma use the following simile : ( Again I am only giving the gist of what She said, not Her own words ): "In order to wash one's face one has first to use soap, but afterwards it has to be rinsed away with pure water." In a similar way She cleanses us from our attachment to the world by attachment to Her own person and later teaches us how to divert this love towards the source of all Love.

Let us now consider the second phase of the operation. By Her radiation of Love Divine and by Her Grace She awakens in us a taste for Divine things. According to the temperament of each individual seeker She greatly intensifies his *sadhana*, be it Kirtan, Japa, meditation or any other practice.

Finally, at a third phase, when we have become sufficiently engrossed in the path that leads to Self-realization, She gradually breaks the bonds of our personal attachment that bind us to Her. She makes us understand that the joy that we feel in Her presence has its opposite, the pain of separation when She is far away, and that this is the same with all things belonging to the objective world : whenever one has a taste of pleasure or happiness it will inevitably be followed by pain or suffering. She makes us see that these joys as well as sorrows are impermanent and as fleeting as a puff of air. Mataji often says that enjoyment derived from sense objects ( *vishaya* ) is like poison ( *vish hai* ). Certain very exceptional bhaktas may avoid this painful breaking of their attachment to Sri Ma's person by transmuting it directly into the Divine Love that is revealed through Her. But such bhaktas are of a rare type.

The way to the Knowledge of Reality leads through the jungle of our innumerable desires. One by one they have to be uprooted and it is ourselves who have to do this work, who have to recognize our errors and abandon them. Nevertheless Mataji gives us powerful help in this. I should like to draw the attention to one special point in Her way of dealing with a situation. It resembles very much the use of vaccination or inocculation by doctors. If for instance virulent bacilli of cholera are absorbed into one's system, one is almost certain to catch the disease, which might possibly prove fatal. But if these bacilli are modified in a certain manner by a laboratorial product that is then injected into the human body under favourable conditions one will most probably develop a little fever, in fact cholera on a very reduced scale, which however will render one immune from this particular disease. In a very

similar way Sri Ma sometimes arranges circumstances for us so that we may reap the fruits of a desire already conceived, but under conditions that will not harm us, only to make us conscious of our error and thereby cure us from it.

I shall now describe a personal experience that will elucidate this point. Last summer I travelled to Solan to spend some time in Sri Ma's presence, after having lived for a whole year in Her Ashram in Almora. At the end of that year it seemed to me that there was nothing left to justify my staying on in India and that to renew my contact with my family, my race, etc., would prove a definite aid to fresh spiritual progress. I had decided either to return to France or else to visit Jerusalem, the holy city of the Western people. Soon after my arrival at Solan I solicited a private interview with Sri Ma so as to learn Her opinion on the matter and to obtain Her permission to undertake the journey. But She does not only read our thoughts even before we have clearly formulated them in our own minds, She also understands our hidden motives of which we ourselves are unconscious. Usually when asked for an interview, She grants it almost at once or at any rate very soon. In this case however She postponed it from day to day and when finally, two months later, at Dehradun I got the chance to talk to Her, the sweetness of Her presence had in the meanwhile melted completely the crust of ice that had held me enclosed and I had quite forgotten my intention to leave India.

Nevertheless my desire had been intense and according to the psychological laws it would have sooner or later had to bear its fruit in action. When Mataji left Dehradun for Vrindaban She advised me to remain for a time in one of Her ashrams near Dehradun. There I found myself among a group of people who treated me with great kindness and affection. Their friendliness, conditions in the Ashram in general, the whole setting, friends, neighbours, the climate—everything co-operated to give me a taste of my home in France. I came to understand the futility and perhaps even the harm from a spiritual point of view that a confrontation with my home atmosphere might have meant. I therefore finally gave up the whole idea. After a time I left Dehradun and stayed in the Ashram at Banaras. There I became friends with a young man from Israel, a fine and serious type of person. He seemed to me to represent the people of Israel and the Holy Land. Through this friendship I came to realize that a visit to his country would have been entirely

different from what I had imagined. I then understood that the Guru is the true father and mother, the *Dharmapita* and the *Dharmamata*, that all those who have chosen the Path of Immortality are my brothers and sisters; that the dwelling-place of the Supreme is my real motherland and whatever helps towards Self-realization my *Svadharma*.

This is how by Sri Ma's Grace I learnt to recognize and renounce my mistake at very little cost, whereas according to the ordinary laws of nature I should have had to undertake a long and tedious journey, beset with all sorts of snares and dangers, inimical to the spiritual life.

It is well-known that Mataji neither gives *Mantra Diksha* nor claims to be a Guru or to have disciples. One day I asked Her what I should reply when people wanted to know, as they often did, whether I had received *Diksha* and who was my Guru. She told me that I might reply in the affirmative to the first question. As to the Guru I should say "God alone can give *Diksha*; there is only one Guru, namely God Himself". (Whenever I quote Sri Ma it must be remembered that I usually do not recall Her exact words but am only giving the meaning of what She said).

On various occasions I asked Sri Ma whether I might regard Her as my Guru. Once She said: "God Himself is the only Guru". On another occasion when I was very insistent, She replied: "I am what you think me to be". Yet thousands revere Her as their Guru.

What underlies the apparent contradiction between what Sri Ma says and what seems to be a fact to us? What exactly is a Guru? Surely the One who opens up the path that leads to Self-realization and guides the disciple till the final Goal has been reached. Initiation by Mantra has real value only if it is instrumental in opening up that path. The opening is really a communion with the Divine and it is the Divine Itself, the Supreme Guru who brings about this communion. The physical Guru acts as a focus, a channel for the Divine Power. But in the case of Sri Ma there is no difference between the physical Guru and the Supreme Guru. I once heard Mataji say: "The Guru is not a human being. It is a sin to look upon him or her as a human being. One must have the same attitude towards the Guru as towards God (*Ishwara Bhava*)".

It is the illusion in which we are caught that makes us limit Mataji to the physical form we perceive. The

perfect sage is by no means confined to what we see and call his body.

If in these few pages I have attempted to describe some aspects of Sri Ma's methods, it must be taken as entirely from my own limited and unenlightened angle of vision. For only one who has direct knowledge of the Supreme Reality which functions in the body which we call Sri Sri Anandamayi Ma will be able to understand Her.

---

# MY FIRST VISIT

*By*

U. C. Dutt, M. A., P. E. S. ( Retd. )

I think it was in May, 1929. In the summer vacation I was going to Mussoorie, the queen of the Hill Stations as a guest of a military officer. I was in high spirits.

I halted at Hardwar at the foot of the Shivalak hills — quite a modernized town in the lap of nature. The long ranges of hills on one side contrast with the everflowing Ganga and the canal on the other. I heard the call of the Himalayas — a clear call it was, I could not resist. I took a different route and moved towards the North. Crossing the Ganga I spent about a week at some Chattis on the way leading to the holy shrine of Badrinath.

Against my wishes I had to return to Hardwar for the sake of a friend of mine who was accompanying me. In the evening I went to Har-ki-pairi and there on the platform met Mahamahopadhyaya Pt. Gopinath Kaviraj, Principal, Government Sanskrit College, Banaras. My joy knew no bounds to see him there quite unexpectedly and I enquired of him if there was any real Mahatma in that locality. Kavirajji told me that Mother Anandamayi had been at Hardwar a few days back. but suddenly had left for Ajodhya. Her father and Kunja Babu ( Swami Turiyananda ) were waiting for Her at a Dharamshala at Bhimgora. He advised me to make further enquiries about Her return at Bhimgora next morning.

As the day dawned I went to the place where the party had stayed. The Mother did not turn up. Her father and the Sannyasi too were reported to have gone to Brahmakunda. I left the place in despair, wandered about at Brahma Kunda and then came down almost exhausted to sit on a ghat in front of the Bholagiri Dharamshala where we were putting up.

Someone came to me and told me that Mother was calling me. "Which mother ?" said I. The reply was 'Mother Anandamayi'. I was taken aback. How was it that one so far could be so near ? She did not know me. How could she call me ? I followed the messenger and went upstairs. Entering a room I saw an exquisitely beautiful lady sitting cross-legged on the floor together with some other

persons. She appeared to be divinely inspired. At once She greeted me with a smile and talked to me as if I had been known to Her for a long time. Respected Kavirajji was there. I sat beside him close to the Mother. Someone requested Her to sing a song. Without a moment's hesitation She started singing, "O Mother, be gracious and make me like a child. Do not allow me to grow old leaving the charms of childhood behind." In a few minutes She was transported to another sphere, Her face was illumined. She lost outer consciousness and plunged into Samadhi. We felt a divine Presence. One was reminded of Sri Rama Krishna who, while singing or talking, passed into the superconscious state at ease and often. After some time in that state some Vedic hymns in a regular rhythm of rise and fall found expression through Her tongue. It appeared that She was an expert in Vedic lore. Kavirajji whispered to me, "Mantras like those of the Vedas are being revealed once more." I was struck dumb with wonder.

Pt. Gopinath Kaviraj and his family put up in the Bholagiri Dharamshala, I too was there. At our request Mother agreed to stay there and the party shifted from Bhimgora. I felt very happy to be in close touch with such an exalted being. Mother was extremely human and at the same time supremely divine — a meeting ground of heaven and earth.

That same evening Mother was sitting on the terrace of the Dharamshala. Just below the Ganga Canal flowed steadily to an unknown destination. The moon shone brightly creating thousands of silver ripples on the running stream. The yonder Shivalak sent occasional sighs to dull the smiling Ganga. The sight was charming. Mother's presence elevated the entire surroundings to a level above the earth. I felt a child at the feet of the Mother. She began to tell me about Her life — how as a girl of three She appeared to lose consciousness on hearing kirtan at a neighbour's house, how this kind of thing repeated itself often, so that Her family became apprehensive and consulted some doctors and Vaids; and how a distinguished physician Dr. Mahendra Ch. Nandy of Kalikutch told Her parents that She needed no treatment, since the symptoms indicated a highly spiritual state. What resembled fainting fits were by no means attacks of epilepsy or due to any disorder of body or mind. They were signs of God-intoxication. People who knew Dr. Mahendra Nandy had great faith in him. Since then Mother was looked upon differently.

A word must here be said about Dr. Nandy. Being a resident of the same village I knew him personally. I have travelled from Assam to the Punjab, but I do not remember having seen the like of him anywhere. A unique personality with a giant figure, a flowing beard and hair all white, of serene appearance, with large, penetrating eyes, dressed in dhoti, chadar and a pair of slippers, he was universally respected. To see him was to touch his feet. Late Bepin Chandra Pal, the great political leader, orator and savant, called him the Tolstoy of Bengal. Though an eminent physician and surgeon he was considered to be a S*iddha Mahatma* (a man of realization). So was his father, the late Ananda Babu, known as Ananda Swami to his numerous Hindu and Muslim disciples. He was an intimate friend of the Brahmo-leader Keshav Chandra Sen and of Mahatma Vijay Krishna Goswami. His grandfather, the late Ram Dulal Dewan, minister of Tripura State, was no less distinguished. Even his son, Ashok, who died in prison during the Swadeshi days, is described by Sri Aurobindo in his Karakahiny as *Yogabhrasta* ( fallen from divine union ). A word from a saint like Dr. Nandy was enough to convince people of Mother's greatness.

I asked Mother if She had committed to memory some of the Vedic hymns which She had recited in the morning. She answered calmly : "Here there is no question of committing anything to memory. Whatever comes, comes of itself. People say it resembles Vedic Hymns." I thought with Carlyle of the great Unconscious through which Truth is revealed to mankind. I got the impression that Mother's mental states were of two kinds : The one of a state of overwhelming, uninterrupted bliss ( *Ananda* ) and the other even more sublime state of S*amadhi*.

I think Mother derives Her name 'Anandamayi' from the first state which was almost a constant phase of Her life at that time. A feeling of unbroken joy becomes natural for one who lives on the plane of bliss or reaches the *Anandamaya Kosha* (sheath of bliss). The other state dawns on transcending all the five sheaths – the physical, the vital, the mental, the psychic and the spiritual. It is a supramental and highly exalted state, comparable to Nirvikalpa Samadhi—a state without modifications, without pleasure-pain tone. Words and thoughts stop short and come back suffocated so to speak, from that unusual height. Blessed are those who attain to that state. They become one with the Supreme Reality. They become omniscient and omnipotent.

As night was approaching I took leave and left Mother to Herself. She sat for long hours all alone, shining in Her own glory.

Next morning I came to learn that Mother had passed into a deep Samadhi some time during the night and there was no sign of her regaining normal consciousness soon. I observed Her for a pretty long time. She appeared to be in a deep sleep, but She was not sleeping, for Her eyes were half open and drawn within, they seemed to have lost all lustre and to be wholly oblivious of the world of the senses. The outer form was lying there, the inner spirit detached from its garb seemed in holy communion with the world-spirit.

A friend of mine, Dr. Nigam of Faizabad happened to be there. I told him to see Mother in that state if he wanted to get an idea of real Samadhi. The doctor was amazed when he saw Her and paid Her homage.

Hours passed. The sun went down the meridian. It was 1 P. M. or so. All felt hungry, even Mother's old father did not take anything without feeding his divine daughter. He began to utter loudly Divine Names close to her ears. No response for about 15 minutes or so. Four or five of us including Kavirajji were in the room. The chanting of Divine Names was continued and a slight change could be noticed on Her features. The eyes began to show signs of life and shed tears in torrents. Her face beamed in a glow. At once I thought of the sattwic signs : *Ashru* ( tears ), *Pulak* (joy), *Kampa* ( trembling ), etc. and said in an undertone to Kavirajji that the next thing might be '*Kampa*'. No sooner was it said than Mother began to shiver violently. All these states began to appear and reappear one after another. Then commenced a sort of tug of war between the sensuous and the supersensuous elements of Her life. As soon as physical consciousness started dawning on the body it was drawn in and She was again lost to the senses. The process continued till outer consiousness reasserted itself. She opend Her eyes and tried to speak, but failed. Some eatables were placed before Her, not so much for Her as for the sake of others, as they wanted Her Prasad. With great efforts She could utter a word or two expressing Her inability to eat anything. Then She lay quietly for some time.

I had seen others in Samadhi, but never before had I witnessed a Samadhi of that type. Such a long period of su-

perconsciousness, no sign of life so to speak and above all the wonderful states that accompanied the regressive process of climbing down to normalcy. I have seen the snow-clad Himalayas touching the sky, the source of the sacred Ganga babbling on pebbles and the sun rising from a blue sea but I have not seen a sight so touching in its majesty as Mother's Samadhi. I may forget everything else, but I can not forget what I saw at Hardwar 27 years ago. It was superb. It was sublime. It surpasses everything.

In the evening I approached Mother and told Her that I had a mind to go to Mussoorie, but if She stayed at Hardwar for some time, I could postpone my departure. Mother gave me to understand that Her movements were uncertain. She might leave at any moment. So She advised me to keep to my programme. Accordingly I arranged to leave Hardwar the following day.

The next morning (3rd day) I bowed to the Mother and told Her that I was going to Sahasradhara first and then to Mussoorie. She suggested going to Sahasradhara as well. I felt very happy to have the privilege of escorting Her to a lovely spot, and to be able to live in Her company at least for a day more. Several ladies and gentlemen together with Mother's father and the Swamiji accompanied Her. We went to Dehradun by train, then took a bus to Rajpur. From there to Sahasradhara we walked a distance of three miles. I hired a dandi for Mother, but She was at the head of the party, walking very fast and leading others. The dandi was used by turns by two old people.

We reached Sahasradhara. A projected hill top was dripping water all the 24 hours, through not thousands but millions of openings. There were a temple of Shiva by the hot spring and a small Dharamshala. We took our bath in the spring and sat round Mother in the temple of Lord Shiva. One could easily imagine that the Divine Mother Parvati had come to her father Himalaya with her children for a short stay. All of us began to feel the presence of a living Goddess in a lonely valley of eternal life. We took our midday meal, talked and laughed and felt that we were children again. We knew one person and She was our wonderful Mother.

Before the sun went down the party left the sweet retreat and moved to Rajpur. A bus was ready to take them back to Dehradun. With a heavy heart I took leave of the Mother and felt very wretched, like an orphan.

That night I passed at Rajpur and thought of the unique experience I had had during those three days.

Years after in 1950 I met Mother at Banaras. She referred to the trip and told a large number of devotees who had collected for Her darshan, that She first went to Dehradun with me and liked the area. Later Bhaktas built some Ashrams there. Then She said jokingly : But Baba went away leaving this small child behind."

Life is a mystery. The intellect is a light no doubt, but not strong or pure enough to pierce through the thick curtain that conceals Reality. A better instrument is needed for the purpose. It is intuition, *Prajna*. Intuition can be easily developed with the help and grace of a dynamic spiritual personality like the Mother. She soars at dizzy heights but keeps Her look on the earth as well. Her earthly life is a reflection of the life beyond She serves as a connecting link between heaven and earth and through Her one can know 'the Great Unknown'. Her presence creates an atmosphere in which the human mind naturally comes to know its limitations and knocks at the door of illumination. In the words of Goethe 'one's soul is charmed, enraptured, feasted, fed.'

I believe that as a form of divine Energy (*Sakti*) Mother has come down to the earth to inspire and guide blundering humanity. May Her visit to this dark planet be sufficiently long so that those who walk with eyes open, may no longer grope in the dark, but see a moving pillar of light. As a mark of profound gratitude I offer my humble tribute of sincere homage and adoration to Mother on the happy occasion of Her Diamond Jubilee Celebrations.

---

# Mother as Revealed to me from a Distance by Looking at Her Picture

( II. )

*By*

Miriam Orr ( Paris )

Whenever I am alone and not obliged to talk I take Mataji's pictures out of my handbag and look at them. This habit or rather this inner urge is so strong that the action of taking Her pictures out of my bag often does not occur. I feel far too near Her and therefore all movements stop. I can picture Her, see and feel Her near me. This however does not mean that I do not need Her pictures, I love to feel them in my bag and am grateful they are there. But when an inner experience of Mother's presence overcomes me I forget Her photographs. It is somewhat as I would not pull out and smell a pocket bottle of perfume when finding myself suddenly in a lovely garden full of flowers, being overwhelmed by their sweet fragrance.

Mother sometimes reveals Herself to me through a strange experience that can hardly be put into words. I feel Her presence in the shape of a globe of radiant light, which is very large and very small all at once and not clearly outlined in the manner of a material form. It has no inner structure as for instance a body with bones, veins, nerves etc., nor diameters like a geometrical sphere. There is nothing of the kind in it, yet it is intensely alive and acutely present. This light seems to have the shape of a ball—but not necessarily—at times it assumes the shape of Mother, at other times not. When it does, it continues to be this light, radiating through Her eyes, through Her smile, streaming forth from Her lofty forehead and from every pore of Her body. I sometimes feel Mother's presence embedded or condensed in the center of this vast globe of softly radiating light. I then can visualize Her movements that are totally different from those of other human beings, although Her body appears to be a human one, made of matter. Our movements spring from wishing and willing, Hers do not: they seem to me the expression of something unfathomable, something beyond this radiance.

Feeling Her moving about or sitting quietly another strange experience supervenes. The light pouring from Her is also a delicate perfume and at the same time a new sort of air. One might perhaps compare the experience to the exhilaration one feels when high up on a mountaintop, where the air is thinner and more transparent than in the valley, when all of a sudden one feels charmed by the scent that streams from the pollen of tiny white mountain flowers ; there everything is suffused with a clarity and width unknown elsewhere.

I feel that Mother moves and abides in a circle of radiant light-air-perfume and that this triad contains a new breathing element, or better a new experience, a new inner sense. Mother reveals Herself to me as a flower made of light, crystallized into the appearance of a human body exhaling a rarified, fragrant mountain air that refreshes us and makes us feel lighter. This experience has taught me that the adjective 'light' and the noun 'the light' mean both the same. Where the Light of the Divine Presence is, we feel 'lighter', we have less weight, are less bound to the earth and less identified with our body.

In this context one can imagine why it is that Mother's body becomes almost weightless at times. She who is Light has not appeared in the shape of a body through a desire, through the will of an ego that creates form and action. Being Light Divine She is egoless. It is my personal belief that a vast group of bhaktas, perhaps unknown to one another, who were deeply devoted to the Divine and loved it with all their hearts, with every fibre of their being "pulled Her down." I mean to say that a powerful, heart and ego-breaking yearning for God lifts us up to Him—Her or pulls Him down to us. The words 'to lift up' and 'to pull down' are inadequate, being antropomorphic and spatial. There can be no 'up and down' in the Divine Light which is beyond space, time and form. God, Mother are very near, quite close to us. I feel Mother to be much nearer than can be put into language. She is within us, permeating every cell, every atom of our being. We have only to pierce through the veil that hides Her from our inner vision. I imagine that our heart and ego-breaking yearning and crying for Her has had the effect of making the Light precipitate as it were into a body perceptible to our senses. On the other hand that heart and ego-breaking longing and weeping

for Her might also perhaps 'lift us up' or in other words destroy the curtain woven by us that conceals the ever-present, formless Light from our vision.

Now, when Mataji addresses people as 'father' and 'mother' and calls Herself everybody's little daughter I feel that we, Mataji's children have pulled Her down into Her body by our calling, weeping and crying; by praying with the fervour of one who is dying from thirst and craves for water: 'Reveal Thyself, make Thyself visible to us.' In this way we may be called Her parents, although of course I do not and cannot know Her reasons for speaking of Herself as everyone's little daughter.

There are some tangible experiences too that I shall try to relate. One morning, a few months ago I received a letter from Germany, which greatly surprised me as I am not in correspondence with anyone in that country. When I opened the envelope eleven snapshots of Mother came out together with a kind letter from a person unknown to me. When examining the photos and puzzled at their number being eleven—(usually 6, 10 or 12 are sent in central Europe and elsewhere)—I felt a sort of inward touch and Mother's soft, warm eyes resting on me. In a flash I remembered what I had forgotten, namely that it was the 11th of the month, my birthday. There is nobody left in this world who would offer his or her wishes on this occasion. Besides I had thought birthday wishes and parties were for babies and birthdays unimportant after a certain age. I am nearer to the departure from this body than to the beginning of life. Suddenly Mataji had reminded me that everything is important in its own right way and that a birthday can be a stimulating event recalling before our inner eye the beginning of our life, our parents, childhood, growth and the time when we began to call Mataji. Thanks to Her I realized that there is no need to forget our birthday and I addressed fervent thoughts of gratitude to my parents, both deceased, — for have I not come to know of Mataji in this body, their gift to me? Thus I hope that my parents will benefit by Mataji's Light in their present abode. I do not know how it happened that the letter by the German lady arrived just on my birthday and why she should have sent the unusual number of eleven photos to me.

Now to another experience: Often I imagine all the details of how it will be when I shall be face to face with Mother's physical form, the body which I believe is Light and gross

matter all in one. The yearning for this event keeps me going, I daresay it keeps me alive in a worn-out, unhealthy body. One evening before falling asleep I pictured Mother to myself in Her Ashram, and fascinated by the subtle, fragrant air-perfume She seemed to exhale, I fell on my knees and then flat to the ground in my whole length before Her, my head touching Her Feet and flooding them with tears of joy and pain. Then sleep overtook me and the next morning I had forgotten all about this I had a busy day in town and as I went to catch the underground late in the evening I remembered that there was hardly anything to eat at home. Feeling hungry I quickly ran to a food store the shutters of which were just being let down, and overpowered by the desire for some special food, I fell as I ran. I felt myself fall first on my knees and then flat to the ground. I cried inwardly: "Mother, why do you want my knees to be hurt and my expensive eye-glasses to bet broken?" But when I rose to my feet again I found to my amazement that my eye-glasses were intact although I had fallen on my face. My knees did hurt for a little while, yet strangely my stockings were not torn. In a flash I understood Mother's lesson; why do you want to fall down before me when you are still greedy for some special food and not well disciplined in your daily life? Curiously enough I had fallen exactly in the manner I had planned to do when I should be face to face with Mother.

The inner presence of Mother has changed my character. I used to have strong likes and aversions. This tendency seems almost wiped out by now. When travelling by the underground at times overcrowded, where close physical proximity to all sorts of people, washed and unwashed, clean and utterly unkempt, smelling of alcoholic drinks cannot be avoided, I do not feel the same revulsion as I used to formerly. Often I look at the most unclean drunkard or vagabond — there are quite a lot of them in Paris — reflecting: he has not yet discovered the Light that is so near him, nay within him, but one day he will and may be sooner than I myself.

The presence of Mataji could indicate new ways for psychotherapy. Psycho-analysis as it is now is no doubt a help to many, but not to all who have undergone psycho-analytical treatment. It deals with the instinctive drives of human beings, and that these exist nobody will doubt. But they are not all there is, even in the case of those who almost seem to consist of them. I do not intend to quote

case histories here and much less even those ( luckily rare ones ) of men who seem to have no other drives or interests than their instincts and the gratification they derive from giving way to them. Such men are sick men no doubt and very hard to cure from their disturbances. Mother's lesson here too is most precious : "Regard everyone you meet as God who reveals Himself in this particular guise."

Mataji, you say that the whole creation is but His garment, is He Himself. Yet how difficult it is for ordinary mortals like the writer of this article to perceive the Creator within His creation all in one ! The very instant we can realize the oneness of the Creator and His creation, although apparently they seem separate from one another, we shall be able to touch the essence of man. Perhaps then a more complete way of psycho-theraphy may be found, thanks to your Grace, Mataji.

---

# REFLECTIONS FROM EUROPE

*By*

Richard Lannoy

I had been away in Europe and had not seen Sri Anandamayi Ma for eighteen months. The car drove along a track and came to a halt before an unfinished dyke. All around was silent in the night. Two boys gestured into the blackness and told me the Ashram was some way off in the middle of a plain. Carrying my bundles I set off through the thorns and scrub. Soon I could make out a small light and the dark, indistinct silhouette of buildings. As I approached I heard a gong sound—it was a quarter to nine and the time of silence. On tiptoe I came near to the terrace and could make out a small building and a single lamp. Figures were seated; there was no sound at all as I peeped into the room but in the flickering light I could distinguish Her seated, wrapped in a white robe, motionless. It was as if this small concentration of silence, serenity and power were quite outside of time, as if it had always been so, had remained just so, an oasis of quiet, subsisting beneath the flux and activity of life and my own mobility, my journeys, my time spent travelling across the sea in Europe and Africa. There had been no apparent interruption, for I felt, as I stood silent in the doorway looking towards Her, that in spite of myself this domain of stillness had resided within me all those months too, but that I had been blind enough to close myself to it and to ignore it. Ever since I first saw Sri Anandamayi Ma I have felt that Her ways and doings, Her activity, Her presence, were not entirely exterior and separate but had its correspondence within myself, were subtly contained within an inner realm of which I have very little knowledge beyond a dim sensing that it exists there. Furthermore I feel it a necessity as well as a duty to make myself more aware of its constant presence and activity and that because the circumstances of my life demand it I cannot depend on frequent contact with the exterior, cannot depend upon being in Her presence very often.

Mine are circumstances not in any way dissimilar from those of millions of people involved in the complexity of living, but who feel a need for

periods of complete quiet and freedom from rush and anxiety. Such periods are not necessarily devoted to religious study, but are nevertheless basically a time when spiritual questions are most likely considered. Man turns from work to quieter occupations, to relaxation of many kinds, to amusement, entertainment, to his dreams, to his children playing about him, to the scenic world, to beautiful architecture and works of art. He does these things as instinctively as eating and sleeping. The rhythm of life demands that we take refreshment, nourish our minds, rest from the strains and worries of work, from the constant necessity to find money enough to keep ourselves alive. The resources available for our relaxation are extremely diverse, in Europe and America almost fantastically elaborate. More and more people in the world have access to libraries, cinemas, the radio, more and more opportunities to discover for themselves the riches of the human heritage, the repositories of wisdom in all cultures. The potentialities inherent in such an opportunity are enormous, so long as the individual is himself prepared to discriminate in his studies and to apply his knowledge to constructive activity. It is impossible to enumerate the benefits of the wide modern dispersal of knowledge. Synthesis of cultural influences is moulding many of the noblest projects in contemporary society and I would cite the Pestalozzi village in the Swiss mountains where orphans of many nationalities are being cared for, educated and the physical ravages of starvation alleviated by medical skill. But the very ease with which people may now have access to the heritage of civilization and can pick and choose from every culture of past and present whatsoever they may be attracted to, has led to very considerable restlessness and to intellectual gymnastics which dissipate the concentrative potential of study into aimless amassing of facts. We have lapsed into a belief that a perceptive far-ranging intellect will end all confusion and solve every problem. If this were really so our ideas could be satisfactorily evolved by an electronic calculating machine.

India herself is in a ferment of change and it may be fairly said that the terrors of famine have been considerably reduced and that her people are more prosperous and hopeful than they have been for a long time.

One cannot regard these things as purely materialistic developments, for Man is not born liberated from his physical limitations, and until that is achieved he must needs work. We are not such perfect instruments as to be in a position to sit back and

do absolutely nothing but wait for God's will to be done. Thoreau, one of the inspirers of Mahatma Gandhi, once said that "the average man spends his life in quiet desperation." People have more in tones of anger than of sorrow often remarked of my home city, London, that the inhabitants have no vitality or freshness and no stillness ; but the sad fact is that the demands of a monstrously artificial city life drain the energy from them. Both collectively and individually they are responsible for their own condition, as much as the people of any community, but when an immense fatigue settles upon a people, the saddest fatigue of all, that induced by wars, the helpless desperation of a man before his dwindling reserves of joy calls for inspiration by great leaders possessed of dynamic spiritual force.

And where are such leaders to be found ? Whatever may be said for the fact that the ultimate source of spiritual regeneration lies solely within the breast of the individual, and within the Self alone his salvation, it needs a giant of strength to maintain and develop the natural flow of the spirit, as it were, against the main current and trend of a whole people. The consciousness of modern man is complex and delicate ; it is the result of mass education and the stimulus of a complex industrialized and technically organized society, with swift global communication. The very ease of contact between the peoples of one nation and another, and the multi-racial nature of the big universities have brought about a high intellectual consciousness of problems on an international scale. It is as if the mind of modern man has almost overreached itself. This delicate organism, should it go wrong, may take years for a psycho-analyst to unravel and be led to recovery. There is too little time and too little money for this kind of lengthy treatment, itself the outcome of the increased consciousness achieved in the present century by the pooling of knowledge from every research study in the world. We cannot simplify all this by ignoring it or thinking we can escape from it, because a momentum of mental energy has gathered, of such power that to dam it up would end in disaster. Assumption of a false simplicity would leave a residue of uncommanded, seething mind untouched by formal, outward renunciation.

You may be wondering why I am emphasizing at length the complexity of the world, in a journal devoted to things of the spirit. I am attempting to clarify the situation which must be facing many of us who, whether

from our own choosing or from circumstances beyond our control, approach Sri Anandamayi Ma with our minds as yet still greatly confused by our environment in a world of complex business and intricate daily affairs wherein lies our source of livelihood. Many of us are not Indians but travellers from all parts of the world, conditioned very differently to follow customs unknown in India and enmeshed, perplexed, driven to despair by the apparent hopelessness of a strife-torn world. Around us our colleagues, friends, families, bear the marks of a spirit mutilated by contemporary events.

Yet, when we come face to face with the momentous simplicity of Sri Anandamayi Ma the power of such calm can instantly dissolve inner turbulence. Whenever I re-experience this encounter I am awe-struck that Her impeccable simplicity is yet so strong, Her bearing containing and emanating such grandeur as to annihilate the knotted mesh of discursive thought and release an energy that at once stills and clarifies my mind. I do not wish to suggest that any particularly violent conflict surges in me, but I know that, as I travel through many countries to picture with my camera the lives of their people, the drama of the world encroaches upon the comparative delicacy of my personal inner life. How frail the human being involved in the bigness of political and social ferment really is! Yet one feels so secure and rich within, as soon as one finds oneself again in this magnetic presence. Whenever I see Her I am reminded of two great artists — Rembrandt and Beethoven, who, as their vision of immortal things was stirred after many years of creative effort on a splendid, yet grandiose scale, were finally purged and attained an austere simplicity in their paintings and musical compositions which bore the mark of serenity. The accounts which I have read of Her life lead me to believe that Sri Anandamayi Ma has however never had conflict, struggle or climax, but has resided always in the grace of pure attainment. Besides a luminous Joy, Her appearance yet conveys the gravity of the challenge She presents to us — for She calls out in our hearts the urgent, fundamental need for true humility, and we become very, very honest about the feeble soul which we smother with an apologetic, pondering mind. Forgetful of the fact that in the mind we have the swiftest instrument with which to bring about a centralizing of meandering ideas, when we approach Sri Anandamayi Ma we recognize that She embodies every quality and level of genuine experience. We discover that, paradoxically, renunciation calls

not for the curtailment of our faculties but brings our whole being to bear upon the dynamic surge of our inner momentum — which is one-pointed, arrow-like, desirous of attaining Joy. How much we know about pleasure, how little about Joy !

Many people have commented upon the feeling, not only of profound contentment which they have felt in the presence of Sri Anandamayi Ma, but of a sense of boundless richness and strength within themselves. She has this unique power of revealing to each in his own way the vitality of his psyche. This is no arm-chair comfort, for She brings this about by Her own example of beautiful simplicity and Her way of exhorting us to do work of the simplest kind, in itself no shirking of hardship, and the assumption of mature responsibility. I feel that this workaday background is of some considerable significance wherein lie the fundamentals of spiritual effort, because in recent years many people in Europe and America have sought comforting creeds in Asia rather from a wish to evade their own psychic problems, than from an integral desire to face crucial and elementary steps in their Sadhana. The medium of routine, even of routine religion has provided them with the fatal excuse of decking out their own weary souls in exotic trappings. It is probably the gigantic scale of world problems and the apparent ineffectuality of the individual which has caused this kind of panic and made many feel an inner poverty. The way to avoid this tendency to "assume borrowed feathers" is surely to become aware of the riches of our own true Selves. The absolute simplicity of Sri Anandamayi Ma presents an urgent challenge to the most crucial personal problems that we are most liable to shirk. There is scarcely any doubt that many who depart from India after brief contact with its mystical tradition are the dupes of their own attempt to adopt anything exotic rather than face themselves. I feel that with Her profound compassion and with Her practical and individual guidance Sri Anandamayi Ma helps one to avoid these pitfalls.

There is a terrible crisis of religion in the West, because we have failed to maintain its vitality in the face of modern civilization. As a result we feel impoverished and empty within, for the signs, symbols and wonders that inspired our forefathers have mysteriously lost their potency, and we must plot new maps for new territory conquered by the mind. We have lost the power to abide in the solitude of the soul and to find contentment at the sources of life, for this instinct has been smothered or disturbed by the

stress of life today. There is no meditation now in the West such as could create Chartres Cathedral in the 13th Century. Through tragedy, heroic struggle and "quiet desperation" Western man may indeed still grow to his full stature, and by a miracle many do achieve serenity. Sheer effort has led Western man away from the profound riches of the soul and from the noblest in his traditions to a condition of separateness, of individual isolation. Significantly enough the most universal sign of a need for religion and an attempt at least to supply a substitute is maintained by the much increased awareness in the West of great religious works of art. The need is there but a way to find serenity is very sorely needed.

No corner of the modern world has felt the absence of this great crisis, but India is fortunate in that Sri Anandamayi Ma lives there, offering welcome and abiding contentment to whomsoever feels an inner need for Her help. To those for whom the world is an almost ineradicable distraction that has split man in two and divided him from himself, by Her simplicity and compassion She presents the supreme challenge. She guides, She inspires, She helps one to cease from shirking one's true responsibilities; above all She leads us to fundamentals, to sincere humility without which there is no beginning. For those who are afraid of life, afraid of God, afraid of religion, She guides them by the supremely beautiful example of Her own pervasive Joy. She begins by offering happiness but She also promises man his birthright – realization of Self.

# DIARY LEAVES

*By*

Atmananda

( 8 )

In summer 1947 Mataji was spending several weeks in Her Ashram at Kishenpur near Dehradun. Sri Haribabaji Maharaj with his party and many of Mataji's devotees had gathered. In June a young couple arrived with their son Ramlal, aged about three. They had been to Hardwar and the child had caught fever there. It looked like a slight indisposition at first, but the fever kept on rising and after a few days typhoid was diagnosed. It was a serious case. Complications soon caused great anxiety to his parents. The patient developed double pneumonia and perforation of the intestines and lay unconscious for days. The doctors had given up all hope of his recovery and the child's mother grew frantic. Very nearly out of her senses she fell at Mataji's feet, sobbing loudly and beseeching Her to save the life of her only son. Mataji used to go to the sickroom several times daily and give minute instructions as to the nursing of the child. His chest had to be padded with cottonwool and She Herself supervised the making of the padding. It was arranged that small groups of us should take turns in singing kirtan at regular intervals just outside of the sick-room. Special japa and puja was performed.

On the 14th day Ramlal's condition seemed extremely critical. Late at night Mataji called Sri Gurupriya Devi (Didi) and asked her to sit by Ramlal's bed from 1-45 a. m. till 2-15 a. m. and do *japa* while catching hold of his body. "Mind you, do not fall asleep", She said, "keep up your concentration without a break.Don't forget to put plenty of cold water on your eyes." Didi did as she was told. When she left the patient's room Ramlal's temperature had come down to 101° for the first time after several days of unabaiting high fever. Mataji asked Didi whether she had felt anything special while sitting by Ramlal. "There was a sense of great fear", Didi replied. "If you had not touched Ramlal's body during that time, he would have felt the fear," Mataji said. Then She related the following: 'This night was the most crucial one of the illness. I saw the apparitions of two men. One was sitting just outside of the garden gate. He

seemed to wait for someone whom he was to take with him. The other figure was standing in the Ashram compound near the window of the sick-room. He was looking at Ramlal and making a gesture as if to say: "At 2 a. m. everything will be over." I then had the *Kheyal* to ask Didi to perform *japa* while holding Ramlal's body. To the old man at the gate I said: 'Go somewhere else!' and he went."

Thereafter Ramlal gradually recovered. He is now a big school boy, hale and hearty.

* * *

It was a rainy day in August 1949. At that time I was staying at a distance of nearly 5 miles from the Ashram. Nevertheless whenever Mataji was at Banaras I used to go to the Ashram every evening almost without exception. But on that muddy day I had given up all hope of getting to Mataji. It had poured with rain for many hours and the sky was still overcast with heavy black clouds. To venture out would have meant wading through mud and rain-puddles for half a mile before I could get a conveyance, if at all a rikshaw-man could be persuaded to take me to such a distance; and even then there was every probability of arriving at the Ashram drenched to the skin and splashed with mud. But lo and behold — a visitor who lived in the Ashram lane turned up in her car. "Mataji is very gracious", I thought, "when I have no other chance to get to Her a car comes along". Without difficulty I got a lift. When we passed through the chowk the owner of the car stopped to make purchases. I availed myself of this opportunity to buy a garland. There was only one flower-seller to be seen and what he had was not at all to my taste, but in spite of this something made me buy a garland.

At the Ashram I found Mataji seated in Her usual place in the hall with only a few ashramites sitting on either side of Her. No one had ventured out into the pouring rain. As a rule Mataji receives lots of garlands but on this occasion no one had brought even a single flower. I felt very apologetic because of my shabby garland. However I offered it and was going to sit down in my usual place when Mataji made signs to me to get out of the way. Surprised I turned round; exactly opposite to Mataji at the West end of the hall I saw an emaciated old lady lying on her bedding that had been spread on the floor. She was very ill and had shifted to the Ashram a few weeks ago, as she wished to die in Mataji's presence and in sight of the Ganges.

It was obvious that her last hour had come. Her son was sitting close by her chanting holy texts while her daughter was attending to her. The dying woman had her rosary in her hand. She was hardly breathing but evidently fully conscious. Her blouse had been loosened and one could see every one of her protruding ribs, in fact she already looked more like a skeleton than like a living person. Mataji was watching her intently. Off and on She would say with a loud voice : "Mother, are you doing *Japa* ?" The old lady could respond only by almost imperceptible gestures. Her daughter confirmed : Yes, she was doing *Japa* and listening to her son's chanting . Mataji suggested sprinkling some Ganges water on her chest and a few drops of the sacred liquid were instilled into her mouth with the help of a piece of cottonwool, since she was too weak to drink. Not for a moment did Mataji let Her eyes off her. I was reminded of the sight of an eagle watching its pray from the air, ready to swoop down on it at the right moment. Suddenly Mataji left Her seat and walked straight to the dying woman. With great motherly affection She gazed at her, placed the garland on her chest and then with a swift and determined gesture passed both Her hands over the shrivelled body from head to foot. The end had come. It was an unforgettable, a most impressive moment. I thought to myself : "Surely this is not death, this is liberation."

"Call the girls to sing Kirtan !" said Mataji, The Brahmacharinis of the Kanyapith came and sang, some of them children of nine or ten. What a beautiful idea it is to make children face death in this atmosphere of peace and serenity ! Everyone felt moved, but there was no weeping, no lamenting, no regret; on the contrary there was a hush, a sense of quiet, pervading joy, of fulfilment. "Death means changing one's clothes," one can often hear Mataji say.

The Kirtan continued for a little while, then the body was taken down to the ghat. Some Ganges-water was poured over the spot where the old lady had breathed her last and an oil-lamp placed there. Everyone left the hall. Fortunate is he who ends his days in this manner.

Some time ago I read that when Sri Ramana Maharshi's mother was about to die, He placed His hands on her head and heart. When afterwards someone referred to her passing away, He corrected : "Not passed away, absorbed."

* * *

An animated discussion was going on, one argument following another, without its leading to any feasible solution. Someone who was getting tired of this endless controversy said : "Mataji, there is a saying that when a lemon is squeezed too much it becomes bitter."

*Mataji* : When fire is raked up it burns brighter. Similarly by discussing religion and philosophy one's interest in these subjects grows. Ofcourse it is also true that a lemon becomes bitter if squeezed too much. But when an earnest seeker discusses with the sincere desire to find Truth, his eyes will be opened. Some people's confusion is cleared up by-reasoning, while others become only, more perplexed by discussing. Every one has his own way. When one's problems are made more acute one feels disturbed and thereby one's Search will be intensified. Before thread can be spun and woven into cloth the pod in which the cotton was enclosed has first to be broken and entirely destroyed. To prepare oneself really means to uproot completely the sense of 'I.' So long as a trace of it is left He cannot shine forth, the revelation of Truth cannot dawn.

* * *

The following question was asked : "Must the fruits of one's actions always be reaped ?

*Mataji* : Certainly.

*The Questioner* : The following is being told about Maudagalāyan, one of the beloved disciples of the Lord Buddha. One day when Maudagalayan was deeply absorbed in meditation, some dacoits came and belaboured him with sticks until he was mutilated and died. When asked why one of his beloved disciples should be subjected to such a dreadful fate, the Lord Buddha explained that in a previous birth Maudagalāyan, misled by the wicked advice of his wife, had lured his parents into the jungle and dealt with them in very much the same way as the dacoits had with him.

My question is, although Maudagalāyan no doubt did incur deadly sin by his despicable action in a former life, could not the fruits of his strenuous *sadhana* counteract the evil results ? Is it not possible to neutralize vicious karma by deep devotion to God and by *sadhana* ?

*Mataji* : So long as Truth has not been realized one is bound to reap the fruits of each action. Since every effect is the cause of a new effect, as long as one moves in the circle of action and its fruit one can go on indefinitely, there is no end to it. But when you reach the state where you become a mere tool in His

hand and feel that He is the actor, then you become free from moral responsibility. In that state fire cannot burn you, nor water drown you. But if you only *think* you are His instrument without this actually being the case, fire will burn you and water drown you : then to leap into fire or water amounts to suicide.

* * *

Mataji sometimes tells the following story which illustrates that destiny cannot be avoided :

"There was a very learned *Brahmana*. One day a poisonous snake entered his house and he saw it sting his wife, son and daughter, one after another, without being able to prevent this. All three succumbed to the bite. In his grief and bewilderment he followed the snake which speedily left his house. After walking a short distance he saw the reptile being suddenly transformed into a buffalo that began to fight with another buffalo and killed it. No sooner was this done than the buffalo changed into a lovely young girl. Two young men come along, each claiming her forh imself. They came to blows, one was wounded, the other died and the girl went away. The Brahman, utterly mystified, followed the girl and soon overtook her. "Who are you ?" he asked. "First you were a snake, then a buffalo and now you are a young woman. You must explain to me who you are." After much pleading the girl at last said : "I am Destiny." "If that is so you will have to tell me how I shall die." "Your death will be in water." With these words she disappeared.

Having lost his wife and children the *Brahmana* decided to leave his home and settle somewhere in the hills, far away from a water course, in order to avoid death by drowning. As he wandered along he came to the house of a rich man, who soon found out how learned he was and on hearing that he was homeless, asked him to remain in his house and become the teacher of his only son. The *Brahmana* agreed and soon became as one of the rich man's family. His pupil grew up, got married and had a son, who became very attached to the old *Brahmana*.

It so happened that on a certain occasion the whole family prepared to go to Banaras to bathe in the Ganges on a specially auspicious day. The Brahmana was invited to join them but declined. The little boy who was so fond of him clung to his neck and begged him again and again to accompany them and finally refused to go without him. His grandfather also tried to persuade the Brahmana,

who remained adamant, yet when pressed very hard finally disclosed his reasons for avoiding to bathe in a river. "Oh, if this is all," exclaimed his host, "you need not feel anxious in the least. For you and the child I shall have a special bathing place constructed, enclosed by a strong fence. You may be quite sure there will be no danger at all." At long last the Brahmana conceded. His host kept his word, but when the Brahmana went to bathe with the child, the little boy put his arms round him and suddenly changed into a crocodile: "Don't you recognize me ? I am Destiny," he said, broke the fence and carried him away into the open river. Destiny will have its way."

* * *

Some time ago a lady from Switzerland wrote a letter to Mataji. Here are her questions and Mataji's replies.

*Question* : Since the religious conception is the highest, the only goal in life, what becomes of those who do not attain to it in their life time ?

*Mataji* : Those who do not attain to the Goal of human existence, have to continue in the realm of death, which is the ceaseless round of birth and rebirth.

*Question* : Since our only reason for living is to return to that from which we came, why is there this life, why were we separated from this Being ?

*Mataji* : Everything is His Will, He is absolutely free, He is His own law. This coming and going is His very nature, His dispensation. He Himself plays with Himself, everything is He and He alone.

*Question* : Will man ever destroy this world and himself ?

*Mataji* : Man has certainly not got the power to create, preserve or destroy. In Him, whose play all this is, all possibilities are contained. The destruction of one's own self virtually amounts to the destruction of the universe. Where this self is, there the world exists. Destruction is the very nature of that which is of the world and therefore perishable; it is ever destroyed, it is being destroyed now and it will be destroyed. But where He is and He alone, who is to destroy whom ? There the question of destruction cannot arise. Where is He, who is THAT SELF ? Find out ! The SELF is not subject to destruction. The ceaseless endeavour to know THAT SELF is man's bounden duty.

*Question* : Is there no love between mortals or must all love be first for God and then love for another being ?

*Mataji :* Between individuals true. unadulterated love or fondness is impossible. Where love or affection has grown perfect this question cannot arise, for in such a case who is the beloved ? God and God alone.

* * *

On December 15th, 1956, the day before Mataji left Banaras far Vindhyachal, a very aged gentleman who loves to discuss with Mataji, asked :

"How is it that so many people, old and young are attracted to you ?"

*Mataji* ( laughing ) : This child is so very small and does not belong to anyone in particular, so all come to her. It is also like this : one who owns nothing and nobody in the world finds that all are his own.

*The old man :* Now you say you belong to nobody, whereas usually you call everyone your father and mother.

*Mataji :* This also is true. All are my mothers and fathers and this is why they come to see their little daughter.

*The old man :* That is what *you* say. But *we* cannot look upon you as our little child.

*Mataji :* Well, then you come because you are so merciful, so compassionate ; you just take pity on this tiny child.

"No," vigorously contradicted the old gentleman, "certainly not, I am neither merciful nor compassionate. Under no circumstances will I accept this kind of explanation."

But Mataji cannot be cornered. "All right," She said, "look, is it not natural to come to one's own Self, does it require a reason or an explanation ? The most natural thing for everyone is to come to his own Self."

# MATRI LILA

( February — April 1956 )

In the last issue of Ananda Varta we had already reported that Mataji reached Banaras on Febr. 3rd from Delhi, only to leave for Vindhyachal on the 5th. Professor Dr. M. Boss, one of the leading psychiatrists of Europe accompanied Her and had long discussions with Her daily until She left for Banaras on the 10th. A medical doctor from California and two English ladies motored to Vindhyachal from Banaras in order to have private interviews with Mataji.

At Banaras Didi's birthday was celebrated by a day of Samyam Vrata with its full programme as well as the food restrictions pertaining to it. On February 16th, Vasant Panchami day, Saraswati Puja was performed in the new hall at the house opposite to the main Ashram building, which has been acquired and added to the Ashram some time ago. It was then in a rather dilapidated condition and has since been completely changed and rebuilt. The general kitchen and store rooms have now been shifted there. On that auspicious day, which is specially sacred to Saraswati (the goddess of learning and music ), the Ashram library which had formally been opened on the occasion of Saraswati Puja in 1952, was assigned a permanent room. It contains books in Sanskrit, Hindi, Bengali and English on religion, philosophy, yoga and allied subjects. Below the library an underground set of rooms has since been constructed and above it a large room with verandas on all four sides.

On March 25th morning a Sanskrit College for Girls was inaugurated in Mataji's presence in a large room above the new hall. Miss Padma Misra, Professor of Sanskrit at the Banaras Hindu University who has been teaching Sanskrit privately for the last several years in the Sri Anandamayi Kanyapith gave the first lesson to a number of young women connected with the Ashram, some of them post graduates in other subjects. Mataji Herself led the Kirtan singing "Satyam, Jnanam, Anantam, Brahman" as appropriate to the occasion.

Here one could observe Mataji taking keen interest in the education of women, seeming to encourage them to study Sanskrit and Philosophy.

There is hardly a constructive activity in which at some time or other we do not see Mataji take active interest, yet She remains aloof and cannot be identified with anything in particular. At one moment She seems immersed in one thing and the next moment we find Her doing or saying something else which may to us express the contrary or else She appears far removed from it and remote. She is indeed quite unfathomable and not to be understood by the mind and if we judge Her by our standards we shall surely be wrong.

On March 1st Mataji went to Vindhyachal returning to Banaras on the 2nd. On the night of March 4th She left for Vrindaban where She remained over Shivaratri and Holi.

When after touring South India about three years ago Mataji went to Dwarka and visited Prabhash, a place specially connected with the life of Sri Krishna, She found a Shiva Lingas there. Soon after three Shiva Linga that had been lying under the bel tree near the entrance of the Banaras Ashram were installed in a small house at the gate of the then new Vrindaban Ashram. We guess that there must be a connection between Mataji's visit to Prabhash and the installation of the three Shiva Lingas at Vrindaban, although we cannot say what exactly is the nature of it. The three Shiva Lingas all hail from the banks of the holy river Narmada in Gujerat, of which it is said that it is as sacred as the Ganges and that every stone on its banks is a Shiva Linga.

Once many years ago before the Bhimpura Ashram had come into existence, when Mataji stayed at Vyas, ( a place on the banks of the Narmada where the sage Vyas is supposed to have lived for a time ), a Dandi Swami offered Her a Shiva Linga which was subsequently brought to Banaras. It was one of the Lingas later installed at Vrindaban. On the occasion of the Shivaratri festival this year two more Lingas were added, donated by two bhaktas in memory of their deceased fathers. All the five Shiva Lingas were then installed in the new Shiva temple in the Ashram grounds, which had only just been completed. The consecration of the temple took place on the morning of Shivaratri, on March 10th in the presence of many Mahatmas and Bhaktas who had gathered from far and near, and throughout the following night Shiva Puja was performed as usual by a large number of men and women sitting in circles round Shiva Linga in the space between the Sri Gauranga and Shiva temples, in the Shiva temple

itself and outside. It was a most solemn occasion. We have for the last two or three years described in detail similar celebrations at Banaras.*

On March 25th Holi was observed in the usual manner with all its fun and frolics.**

On March 28th Mataji left for Hoshiarpur. Last winter before he fell ill, Sri Haribabaji Maharaj had started building at Hoshiarpur a Satsang Bhawan, a spacious hall to be dedicated to religious gatherings only. Adjoining to it he had a set of rooms constructed specially for Mataji's use. The rooms were just ready when Mataji arrived. As they invariably do, Sri Haribabaji's people gave Mataji a tremendous and spectacular reception. These receptions are something unique, quite indescribable, something that one must have seen to be able to imagine it.

We feel that we must here say a word of praise about the enthusiasm and religious fervour of the Punjabis, especially the women, who attended the Satsang with surprising devotion and regularity, sitting quietly for many hours and keeping excellent discipline, even when they came in huge crowds.

On April 8th Mataji proceeded to Jullundur, from there by car to Chandigarh and on the 9th evening to Vrindaban. On the 11th She was at Aligarh from where She entrained on the 12th morning, reaching Banaras the same night.

On April 13th, *Chaitra Sankranti*, the last day of the Bengali year, the anniversary of Didima's taking Sannyasa was for the first time solemnly celebrated in the Banaras Ashram by a full programme of Arati, Kirtan, the reading of Scriptures etc. and at night Swami Shashwatananda gave an inspiring talk about Her life and character. 'Didima', as Mataji's mother is lovingly called by all the thousands of Mataji's children, took Sannyasa at Hardwar soon after her husband passed away about 18 years ago. Sri Mangalananda Giri, the Guru of the late Swami Akhandananda, Sri Gurupriya Devi's father, gave her Sannyasa and her name since then has been Swami Muktananda Giri.

Utterly simple, quiet and unassuming she has always been of an extraordinary saintliness. Throughout her life she never felt angry or quarrelled with anyone. Never has she spoken ill of others, never told a lie. Little is known about her childhood, but it is a fact that she was an ideal wife and mother. Her life has

* See Ananda Varta, Vol. II / 1, p. 100 and Vol. III / 1, p. 36.

** See Ananda Varta, Vol. I / 3, p. 134 and Vol. III / 1, p. 38.

by no means been an easy one. Her husband, a saintly person like herself, was given to much meditation and at times went away for shorter or longer spells to live the life of a Sadhu, so that the task of looking after house and family had often to be faced by her alone. She had to manage on a bare minimum, but this did not embitter her in the least, she accepted her lot without questioning, never losing faith in Providence.

From the beginning she felt that Mataji was not an ordinary child, but this did not make her proud in the least. At Mataji's birth there was no labour, nor did Mataji cry as babies do first thing when they are born, nor did she ever cry during Her childhood except once when She saw Her mother mourn the loss of her three little brothers—and even then She only cried to divert Her mother's attention so as to be able to console her.

One of Didima's outstanding qualities is her intrinsic kindness and compassion. She concerns herself with the weal and woe of everyone who comes within her orb and is ever kind and helpful even to those who are considered bad by others and find no sympathy elsewhere.

After taking Sannyasa she showed a spirit of true renunciation and, revered and loved by all, she later began to give Mantra Diksha, since Mataji Herself does not give Diksha. Thus the gentle, unassuming old lady is now the Guru of a large number of disciples. who one and all look up to her, not only because she is Mataji's mother, but for her own outstanding qualities ; for she lives the ideals that she professes and asks them to follow. She is a true Guru, without a trace of a feeling of superiority towards anyone, leading a life of complete dedication to the Divine. Few know that there is also an artistic side to Didima. Although she has had nothing more than a village education, she has composed a great many religious songs and poems.

* * * *

From April 19th to 22nd Vasanti Puja, which is the Durga Puja of the spring season, was celebrated. It is an annual function of the Banaras Ashram, which this time gained special impetus by Mataji's presence. On this festive occasion the inauguration of a permanent set of rooms took place that has at last been built for the *Anandamayi Karuna* and the "Shishu Kalyan", charitable institutions related to the Ashram. Both were started in 1952 due to the initiative and the spirit of untiring service of Dr. Gopal Das Gupta and have ever since been of active help and assistance to the poor. But

no permanent place had been allotted to them so far. The *'Anandamayi Karuna'* is a homoeopathic dispensary which gives free medical advice and medicine to everyone. A competent homoeopathic doctor assisted by a compounder are in attendance twice daily for several hours and a very large number of patients are taking advantage of the institution. We hope to be able to add a small hospital to the dispensary. The *'Shishu Kalyan,* distributes free goat's milk to some very young children of the destitute. For this purpose some four years ago a small goat farm was started on a plot of land near Sankat Mochana.

On conclusion of the Vasanti Puja Mother very graciously granted the prayer of Her devotees at Banaras to stay on for the forthcoming 60th birthday anniversary commencing from May 2 and lasting till May 28. We have already mentioned in our earlier issue about the decision to celebrate this happy occasion in a befitting manner. It is indeed a piece of singular good fortune for us that we have got this rare opportunity in our lives to witness and participate in a unique function like this. As has been said "the descent of the Divine Mother on earth, a descent of the timeless in time, marks in itself an important event but the completion of the cycle of the first sixty years of Her holy life is an event of even greater spiritual significance in the history of man". In order that all Mother's Bhaktas and devotees in India and abroad may have the fullest opportunity to avail themselves of this glorious occasion and participate in the various functions, the Sangha has set up a new work of centres in all parts of the country functioning in close co-operation with and under the supervision of the main centre and head office of the Sangha at Banaras. This attempt at organized work, it may be added, on an all-India and even wider basis is the first venture of its kind undertaken by the Sangha. The work in preparation for the forthcoming Jayanti Celebration has so far fulfilled our expectations and this encourages us to hope that, with Mother's blessings, the various actual functions scheduled for the celebrations will be crowned with success and thereby become a harbinger of incalculable good for all humanity.

---

# A Message from

## MAHAMAHOPADHYAYA SRI GOPINATH KAVIRAJ

ON THE OCCASION OF THE SIXTIETH JAYANTI CELEBRATIONS

OF

## SRI SRI MA ANANDAMAYI

**The Sixtieth Birthday Anniversary and the Sixty-First Birth Day Celebrations of Sri Sri Ma Anandamayi fall together and will take place at Banaras in May 1956, commencing from the 2nd day of the month and continuing up to the 27th. The descent of the Divine Mother on earth, a descent of the timeless in time, marks in itself an important event, but the completion of the cycle of the first sixty years of Her holy life is an event of even greater spiritual significance in the history of man. The international horizon is overcast with ominous clouds and the moment is really fraught with immense possibilities for the future. Mother's Bhaktas are taking the lead in gathering together from different parts of the country under the banner of the Anandamayee Sangha at holy Banaras and organizing themselves in a befitting manner to celebrate this most happy occasion by participating in its varied functions. It should be our earnest endeavour to resolve to dedicate ourselves as far as we can to Her beneficent will as the only tribute worthy of the occasion we can lay at Her feet and to propitiate Her to reveal to us Her abounding Grace by purifying and elevating the human mind and by showering upon it on transformation Her choicest blessing.**

# NOTES AND COMMENTS.

We are happy to announce the publication of the long-awaited volume "Mother as Seen by Her Devotees" in English. It will be on sale during the Jayanti Celebrations.

The following books are in the press and are expected to be out during the Jayanti Celebrations—

1. Sri Sri Ma Anandamayi
   by Sja. Guru Priya Devi
   Part III ( in Hindi ). Rs. 2/-
2. Sri Sri Ma Anandamayi
   by Sja. Guru Priya Devi
   Part I (in Bengali) New edition.
   Rs. 2/-
3. A book in Bengali for children by Brahmachari Sailesh. "Shuno Bali Mar Katha"—Rs. 1/8/-
4. An Album of Mataji's photos
   Rs. 1/8/-
5. Jayanti Souvenir (in English).

* * *

A gramophone record with the following two songs sung by Mataji has been brought out, viz. "Satyam Jnanam Anantam Brahman" ( सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म ) and "Pran Gopal, Brahm Gopal" ( प्राण गोपाल ब्रह्म गोपाल ).

* * *

The March 1956 issue of the French magazine 'Realites', which has also an English edition and has a circulation of 250,000 all over Europe and America contains two large beautiful reproductions of Mataji's photos.

* * *

In the next issue of Ananda Varta we hope to include an account of the Jayanti Celebrations and the various functions organized in this connection.

---

# List of Publications by the Shree Shree Ma Anandamayee Sangha

## B 2/94, BHADAINI, BANARAS.

| No. | Names of Books | Language | Author | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matri Darshan ... ... | Bengali | Bhaiji | 2 0 0 |
| 2. | Matri Darshan ... ... | Hindi | ,, | 2 0 0 |
| 3. | Matri Darshan ... ... | Gujrati | ,, | 2 0 0 |
| 4. | Matri Darshanam ... ... | Sanskrit | ,, | 1 8 0 |
| 5. | Mother as Revealed to Me (English Version of Matri Darshan) | English | ,, | 2 0 0 |
| 6. | Sadvani ... ... ... | Bengali | Bhaiji | 1 0 0 |
| 7. | Sadvani ... ... ... | Hindi | ,, | 1 0 0 |
| 8. | Sri Sri Ma Anandamayi | Bengali I | Gurupriya Devi | 2 0 0 |
| 9. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, II | ,, | 2 0 0 |
| 10. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, III | ,, | 2 0 0 |
| 11. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, IV | ,, | 2 0 0 |
| 12. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, V | ,, | 2 0 0 |
| 13. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, VI | ,, | 2 0 0 |
| 14. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, VII | ,, | 2 0 0 |
| 15. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, VIII | ,, | In Press |
| 16. | Sri Sri Ma Anandamayi | Hindi I | ,, | 2 0 0 |
| 17. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, II | ,, | 2 0 0 |
| 18. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, III | ,, | In Press |
| 19. | Mother as seen by Her Devotees | English | Devotees | In Press |
| 20. | Matri Lila Sankirtan | Bengali | ,, | 0 4 0 |
| 21. | Matri Lila Sankirtan | Hindi | ,, | 0 5 0 |
| 22. | Akhanda Mahayajna | Bengali | Gurupriya Devi | 2 8 0 |
| 23. | Akhanda Mahayajna | Hindi | ,, | 2 8 0 |
| 24. | Ma Anandamayi Upadeshamrita | Bengali | ,, | 1 8 0 |
| 25. | Ma Anandamayi Upadeshamrita | Hindi | ,, | 1 8 0 |

## PHOTOS & BLOCK PRINTS OF SRI SRI MA

1. Photo Print Rs. 15/- (mounted)
2. ,, ,, Rs. 10/ ,,
3. ,, ,, Rs. 5/ each
4. ,, ,, Rs. 3/ each
5. ,, ,, Rs. 1/8/- each
6. ,, ,, Re. 1/- each
7. ,, ,, As. -/8/- each
8. Block Print Re. 1/- each Seashore
9. ,, ,, Re. 1/- each Chuda
10. Bengali Album Rs. 2/- each
11. ,, ,, Rs. 1/8/- each
12. English Album Rs. 2/- each
13. ,, ,, Rs. 1/8/- each

## Grammaphone Records of Mataji's Voice

1. Talks—पुजा का उद्देश्य—इष्ट प्रकाश । भगवान एक हुये भी वहु, वहु हुये भी एक । Price–Rs. 3/-
2. Bhajan—কৃষ্ণ কানাইয়া, বংশী বাজাইয়া (Krishna Kanheya)

   कृष्ण कन्हैया, वंशी वजइया

   হে ভগবান (The Bhagvan)

   हे भगवान

   Price Rs. 3/-